সাপ্তাহিক সংকলন

রেজি: ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-১৭ | সোমবার, ৩০ আষাঢ় ১৪২১, ১৫ রমজান ১৪৩৫, ১৪ জুলাই ২০১৪ ৬৪ পৃষ্ঠা ২০ টাকা

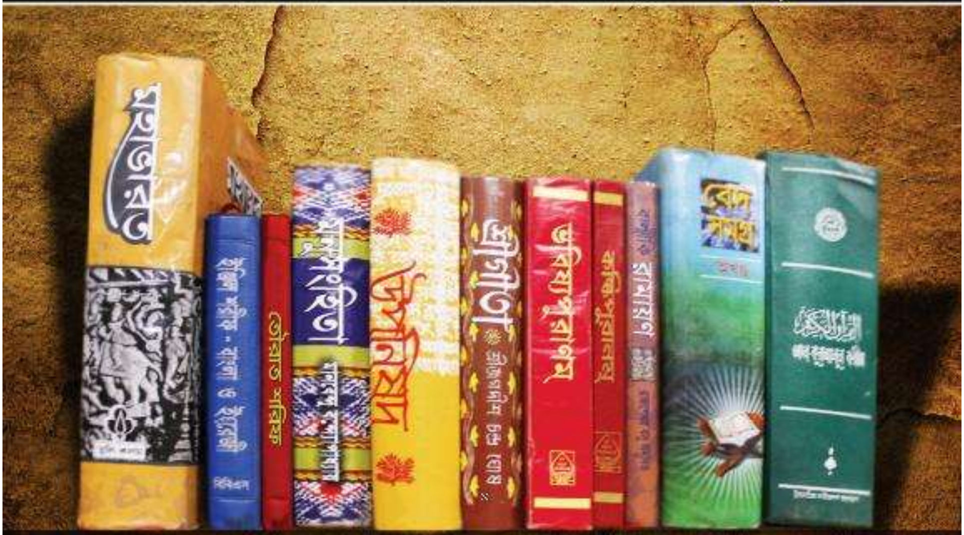

সনাতন ধর্ম

একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান- পৃ: ২
হিন্দু নয়, সনাতন- পৃ: ২৩
সকল ধর্মেই ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ- পৃ: ৩২
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: রাজনৈতিক হাতিয়ার- পৃ: ২৮

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ
দৈনিক দেশেরপত্র

সম্পাদকীয়

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

আমাদের এই সাপ্তাহিক সঙ্কলনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিষয়গুলি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। উইকিপিডিয়ার হিসাবমতে বিশ্বের মোট সনাতন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ১১০ কোটি ১৫ লক্ষ। তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে আমরা যা বোলতে চাই তা হোচ্ছে:

➡ সমগ্র মানবজাতি একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। সেই হিসাবে সকল মানুষ ভাই ভাই। এ বিষয়ে সকল ধর্মগ্রন্থই একমত। মানবসৃষ্টির পর থেকে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রসুল পৃথিবীতে এসেছেন, তারা সবাই একটি ধর্মই নিয়ে এসেছেন যার নাম সনাতন ধর্ম বা দীনুল কাইয়্যেমাহ। সনাতন শব্দের অর্থ হোল চিরন্তন, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। এভাবে ভারতবর্ষেও বহু নবী রসুল এসেছেন, যাদের শিক্ষা থেকেই সৃষ্টি হোয়েছে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের। আমরা সনাতন ধর্মের সেই অবতারদের নবী-রসুল বোলে বিশ্বাস কোরি এবং তাদের আনীত শিক্ষাকে অহি এবং গ্রন্থাবলীকে আল্লাহর কেতাব বোলে বিশ্বাস কোরি। সকল নবী-রসুলের প্রতি, সকল আসমানি কেতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা একজন মোসলেমের ঈমানের অংশ। নবী রসুল অবতারদের ধারাবাহিকতায় সবশেষে এসেছেন মোহাম্মদ (দঃ)। আমরা তাঁর উপর যেমন ঈমান রাখি তেমনি এব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ), রামচন্দ্র (আঃ), শ্রীকৃষ্ণ (আঃ), বুদ্ধ (আঃ), কনফুসিয়াস (আঃ) এঁদের সকলের প্রতিও সমভাবে ঈমান রাখি এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তাদের প্রতি সালাম পাঠাই (ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন- কোর'আন, সুরা সাফফাত ১৮১)। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য কোরি না (লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মীর রসুল- সুরা বাকারা ২৮৫)। আমরা মনে কোরি, যারা আল্লাহর প্রেরিত অবতারদের একজনকে পূজা ও শ্রদ্ধা করে আর অপর একজনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে তারা কখনোই সত্যধর্মের অনুসারী নয়। তারা কখনোই স্রষ্টার সন্তুষ্টি পাবে না, স্বর্গ বা জান্নাতলাভ তাদের সুদূর পরাহত।

➡ প্রতিটি ধর্মের ধ্বজাধারী শ্রেণি আল্লাহর প্রেরিত ধর্মকে অতি বিশ্লেষণ কোরে সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গেছে এবং সেই বিকৃত ধর্মকে পুঁজি কোরে ব্যবসা কোরে যাচ্ছে। তারাই ভিন্নধর্মের প্রতি ঘৃণা বিস্তার কোরে মানবজাতির মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি কোরে রেখেছে, যা কখনো কখনো দাঙ্গায় রূপ নেয়। এই সাম্প্রদায়িকতাকে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার করে অসাধু রাজনৈতিক বেনিয়া। ভারতবর্ষে এই নোংরা খেলার সূচনা করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা। তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে ভাই ভাইয়ের, এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর চরম শত্রুতে পরিণত হোয়েছে। তাদের বাধিয়ে দেওয়া রায়টে লক্ষ কোটি হিন্দু-মুসলমান জীবন হারিয়েছে, বাসভূমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হোয়েছে। সেই রক্তক্ষরণ আজও বন্ধ হয় নি। আমরা হেযবুত তওহীদ, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারীরা এই রক্তক্ষরণ বন্ধ কোরে সমস্ত মানবজাতিকে একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার পথের সন্ধান পেয়েছি এবং সেই লক্ষ্যে কাজ কোরে যাচ্ছি।

➡ আমরা মানবজাতির সামনে একটি ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধোরেছি। সেটা হোল: মানুষের হাজার হাজার (হয়তো লক্ষ লক্ষ) বছরের ইতিহাসে মানুষ শান্তি পেয়েছে কেবলমাত্র স্রষ্টার বিধানে। আমরা রামরাজ্যকে এবং এসলামের স্বর্ণযুগকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি। আর যখনই মানুষ নিজেই নিজের জীবনব্যবস্থা রচনার ভার নিয়েছে তখনই অশান্তিতে পতিত হোয়েছে। বর্তমানে আমরা মেনে চোলছি পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী গণতন্ত্র যার পরিণামে আমরা চরম অন্যায় অশান্তিতে ডুবে আছি। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে স্রষ্টার বিধানে ফিরে যেতে হবে। স্রষ্টার বিধান বোলতে আমরা আদিগ্রন্থ বেদ, বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক, জিন্দাবেস্তা, তওরাত, যবুর, কোর'আন সবগুলিকেই বোঝাচ্ছি। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা কোরে কাউকে সেই ধর্মগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কথা হোচ্ছে, যার যার ধর্মে যে সত্য বর্ণিত আছে তারা সেই কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত হোলেই শান্তি আসবে। তবে সবাইকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া মতবাদগুলিকে প্রত্যাখ্যান কোরতে হবে।

সূচিপত্র

- একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান-২
- শিয়া-সুন্নী এক হোক বৈষ্ণব-শাক্তও এক হোক-১২
- বিভিন্ন ধর্মে ফেরেশতা ও দেবদেবীর ধারণা-১৪
- হিন্দু নয়, সনাতন-২৩
- বিভিন্ন আধার" "মূল ধর্ম এক বটে, বিভিন্ন আধার"-২৪
- সে মার রহিল জমা- ২৭
- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজনৈতিক হাতিয়ার-২৮
- সকল ধর্মেই ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ-৩২
- ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর রসুল মনু (আঃ)-৩৫
- ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?-৩৮
- এমামুয্যামানের প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে সর্বধর্মীয় সম্মেলন -৪৪
- পারিবারিক শান্তিরক্ষায় নারীর ভূমিকা-৪৭
- শাসকই পারেন সত্যযুগ ফিরিয়ে আনতে-৫০
- অসম্মান এবং সম্মানের আতিশয্য-৫২
- দাঙ্গাকারীদের স্বর্গ নেই-৫৩
- মূর্তি এখন বিধাতার আসনে নেই, বিধাতার আসনে পশ্চিমা সভ্যতা-৫৪
- জাতীয় ঐক্যের পথরচনা-৫৫
- চলমান সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস থেকে মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ-৫৭
- মাননীয় এমামুয্যামানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-৬০
- কে তুমি পথিক? -৬৪

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: রুফায়দাহ্ পন্নী
প্রকাশক : অ্যাডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpatro14@gmail.com

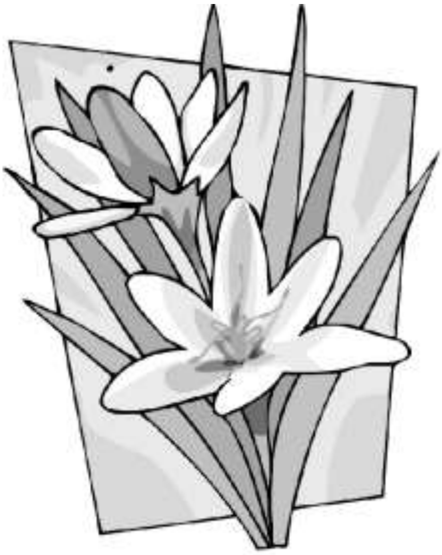

একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান

রিয়াদুল হাসান

ধর্মের নামে দাঙ্গা কোরে আমাদের এই বাংলার মাটি, এই উপমহাদেশের মাটি অসংখ্যবার রক্তে রঞ্জিত হোয়েছে। হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অবজ্ঞা, মুসলমানের প্রতি হিন্দুর ঘৃণা যেন তাদের আত্মার গভীরে প্রোথিত। মাঝে মধ্যেই সামান্য ঘটনায় জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন। সেই আগুনে ঘি ঢালে উভয় ধর্মের ধর্মব্যবসায়ী আর স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সকলেই কামনা করে কিন্তু এই মিলনের পথে পাহাড়সমান অন্তরায় হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় ও সংস্কৃতির ব্যবধান। এই পাহাড় তারা কোনো উপায়েই ডিঙোতে পারে না, সদিচ্ছা বা প্রচেষ্টারও যথেষ্ট ঘাটতি রোয়েছে। সাধারণ সময়ে এই বাধাটি বড় হোয়ে দেখা না দিলেও আঞ্চলিক রাজনীতিতে কোন বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হোলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এ বৈরিতার সম্পর্ক প্রকট আকার ধারণ করে, অনেক ক্ষেত্রেই তা ধর্মীয় দাঙ্গার পাশবিক রূপ নেয়; হিন্দু ও মুসলমান উন্মত্ত রোষে একে অপরের ধ্বংস-সাধনে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরকার পরিবর্তনের সময় আসলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আমাদের দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বুক দুরু দুরু করে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একই অবস্থা মুসলিমদের। এটাই হোচ্ছে এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ভেতরকার চিত্র। কিন্তু এমন কি হওয়ার কথা ছিল? কোনো ধর্ম কি মানুষকে এমন বর্বরতার শিক্ষা দেয়? এই হানাহানিতে কি স্রষ্টা খুশি হোচ্ছেন? কে এতে লাভবান হোচ্ছে? কারা এই অবস্থার সৃষ্টি কোরল? আজ আমরা এই প্রশ্নগুলির সমাধান খুঁজতে চেষ্টা কোরব।

ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মহান স্রষ্টার ইচ্ছায় এ অঞ্চলের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই একই ভূখণ্ড বাংলাদেশের বাসিন্দা। আমরা সকলেই বিশ্বাস কোরি যে মহান স্রষ্টা একই দম্পতি থেকে মানবজাতি সৃষ্টি কোরেছেন, অথচ আমাদের মধ্যে বিরাজ কোরছে অসংখ্য বিভেদের প্রাচীর। আমরা একে অপরের সঙ্গে শত্রুতায়, দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতে লিপ্ত হোয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বিরাজ কোরছে সীমাহীন অশান্তি, অবিচার আর অন্যায়।

কিন্তু এ অবস্থার জন্য কে দায়ী? দায়ী আমরা সকলেই। মহাজ্ঞানী স্রষ্টার বিধান প্রত্যাখ্যান কোরে আমরা সমস্ত মানবজাতি আজ স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন, নৈতিকতাহীন, বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, প্রথাগত রাজতন্ত্র ইত্যাদি জীবনব্যবস্থা মেনে জীবনযাপন কোরছি। মানুষের তৈরি ব্যবস্থা কখনোই ত্রুটিহীন হোতে পারে না। সেই ত্রুটিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, ভারসাম্যহীন অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, নৈতিক শিক্ষাহীন বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের সমগ্র জীবনই হোয়ে পড়েছে চরম ভারসাম্যহীন, এর পরিণামে আমরা সবাই অশান্তি ভোগ কোরছি। কিভাবে এই অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি, কিভাবে আমরা নিজেদের মধ্যেকার সকল অনৈক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে একটি শক্তিশালী জাতি গঠন কোরতে পারি সেটাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন দেখতেন জাতীয় কবি নজরুল। তিনি বোলেছেন,

মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।
মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।

সকল ধর্মই এই বিষয়ে একমত যে সমগ্র মানবজাতি একই পিতামাতার সন্তান। এসলাম ধর্মে তাঁদেরকে বলা হোয়েছে আদম ও হাওয়া, আর ভবিষ্যপুরাণে বলা হোয়েছে আদম ও হব্যবতী। ভবিষ্যপুরাণে মানবসৃষ্টির বিবরণ নিম্নরূপঃ

আদমো নাম পুরুষঃ পত্নী হব্যবতী তথা (ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্বঃ ম্লেচ্ছযজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন, কলিকৃত বিষ্ণুস্তুতি)

কোর'আন ও পুরান উভয়ই একমত যে, কর্দম থেকে ম্লেচ্ছের বংশ প্রবর্ধনকারী উৎপন্ন হোয়েছিল (সুরা হেজর ২৬ এবং ভবিষ্যপুরাণ)। এ সম্পর্কে ভবিষ্যপুরাণের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"এই প্রকার ম্লেচ্ছ ভার্যার সঙ্গে কলি ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি করছিলেন। তখন ভক্তের প্রতি ভালোবেসে ভগবান্ শ্রীহরি প্রকট হোয়ে তাকে বলেন, 'দেখ, তোমার ভালোর জন্য যুগোত্তম বহুরূপ ধারণ পূর্বক তোমার ইচ্ছা পূরণ করব। আদম নামক পুরুষ তথা হব্যবতী নামক পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করব।'

ইন্দ্রিয়দমনকারী, ধ্যানপরায়ণ যিনি ছিলেন তিনি হলেন আদম ও তাঁর পত্নী - হব্যবতী। পূর্বভাগে মহাবনযুক্ত, চতুক্রোশ বিস্তৃত নগর ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন। আদম তাঁর পত্নী হব্যবতীকে পাপবৃক্ষের নীচে দর্শন কোরতে তৎপর হন। কলি সেখানে সর্পরূপ ধারণ করে চলে আসেন। সেই ধূর্ত বিষ্ণুর আজ্ঞাপালন না করে তাদেরকে বঞ্চিত করেছিল। পতি আদম লোকমার্গপ্রদ রম্যফল ভক্ষণ করে। তারা দুজনে উদুম্বর পাতা দ্বারা বায়ুকে অশন করেন। এরপর সুতপুত্র হোয়েও সকলে ম্লেচ্ছ হোয়ে গেল। (ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্বঃ ম্লেচ্ছযজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন, কলিকৃত বিষ্ণুস্তুতি)।

কোর'আন হাদিস ও বাইবেলে পাওয়া আদম হাওয়ার বর্ণনার সঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনা প্রায় শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভগবান শ্রীহরি হোলেন আল্লাহ স্বয়ং। তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে সৃষ্টি কোরেছেন। এজন্য তিনি নিজের রূহ আদমের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন। পুরাণে একেই বলা হোয়েছে 'আমি আদম নামক পুরুষ তথা হব্যবতী নামক পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করব।' আদম ইন্দ্রিয়দমনকারী ও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। বসবাসের জন্য তাদেরকে জান্নাতের একটি উদ্যান যার নাম জান্নাতুন আদন আল্লাহ প্রদান কোরেছিলেন। একেই ভবিষ্যপুরাণে বলা হোচ্ছে 'মহাবনযুক্ত, চতুক্রোশ বিস্তৃত নগর'। আল্লাহ সেখানে আদম ও হাওয়াকে সকল প্রকার ফলমুল আস্বাদনের অনুমতি দিয়েছিলেন, কেবলমাত্র একটি মাত্র বৃক্ষের (পাপবৃক্ষ) নিকটে যেতে এবং তার ফল (রম্যফল বা গন্দম) ভক্ষণ কোরতে নিষেধ কোরেছিলেন। কিন্তু এবলিস অর্থাৎ কলির প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া আল্লাহর সেই নির্দেশ অমান্য করেন। এভাবেই তাদের পদস্খলন ঘটে। তারা পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জানিবারণ কোরতে চেষ্টা করেন। এভাবেই আল্লাহর পবিত্র সৃষ্টি (সূতপুত্র) আদম ও হাওয়া ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পাপী বান্দায় পরিণত হন।

জান্নাত থেকে বিতাড়নের সময় আল্লাহ আদমকে (আঃ) বোলে দিলেন, তিনি মানবজাতির জন্য জীবনব্যবস্থা পাঠাবেন যা অনুসরণ কোরলে মানুষ শান্তিতে বসবাস কোরতে পারবে (সুরা বাকারা ৩৮)। অন্যথায় অশান্তি অনিবার্য। এই জীবনব্যবস্থাই হোচ্ছে শাস্ত্র। যাদের মাধ্যমে আল্লাহ এই শাস্ত্রগুলি পাঠালেন তারাই হোলেন অবতার বা রসুল। আমরা হাদিস থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দু-লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলের কথা জানতে পারি, যাদের মধ্যে ২৫ থেকে ২৮ জন নবীর নাম কোর'আনে এসেছে। ভাগবত পুরাণে বিষ্ণুর ২৫ জন অবতারের নাম উল্লেখ করার পর ঘোষিত হোয়েছে যে বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য, তবে উল্লেখিত পঁচিশ অবতারের গুরুত্বই সর্বাধিক। এদের মধ্যে অনেকেরই নবী হওয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোসলেম হওয়ার শর্ত হিসাবে আল্লাহর সকল নবী-রসুলগণের উপর বিশ্বাস রাখা ফরদ এবং তাদের কাউকে নবী হিসাবে মানা এবং কাউকে অস্বীকার করা কুফর। (সুরা বাকারা- ২৮৫, সুরা নেসা ১৫০-১৫২)।" তাই উপমহাদেশে আগত মহাপুরুষদের মধ্যে যাদের নবী-রসুল হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় তাদেরকে অবজ্ঞা করার বা বিধর্মী পৌত্তলিক মনে করার কোনো সুযোগ নেই। আর দীর্ঘ কল্পময় পৌরাণিক ব্যাখ্যা আর কালের ধুলোর নীচে যাদের জীবন ইতিহাস পুরোপুরি চাপা পড়ে গেছে অথবা যাদেরকে অতিভক্তির আতিশয্যে স্বয়ং ভগবানের স্থান দেওয়া হোয়েছে তাদের প্রতিও অশ্রদ্ধার উক্তি কোরতে আল্লাহ নিষেধ কোরেছেন। তিনি বোলেছেন, "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তাঁরা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।" (আল-আন'আম, আয়াত ১০৮)। আল্লাহর এই নির্দেশের মধ্যেই নিহিত আছে সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতার মূলসূত্র। আল্লাহর এই ঘোষণার পর একজন প্রকৃত মুসলিমের দ্বারা অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন সুযোগ থাকে না।

সনাতন ধর্মের গ্রন্থগুলির মূল শিক্ষার সঙ্গে এসলামের শিক্ষার অদ্ভুত মিল রোয়েছে। শত শত শ্লোক থেকে প্রমাণ করা যায় যে বেদ নিখুঁত একেশ্বরবাদের ধারক।

ভাগবত পুরাণে বিষ্ণুর ২৫ জন অবতারের নাম উল্লেখ করা হোয়েছে। তারা হোলেন চতুর্সন, বরাহ, নারদ, নর-নারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম, ধন্বন্তরী, মোহিনী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্যাসদেব, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, প্রশ্নিগর্ভ, হয়গ্রীব, হংস, কল্কি। এঁদের মধ্যে দশজন প্রসিদ্ধ যাঁদেরকে দশাবতার বলা হয়। (ছবি: Brahmbandhu UK) একই ভাবে পবিত্র কোর'আনেও ২৫ বা ২৮ জন নবী-রসুলের নাম উল্লেখ করা হোয়েছে।

হিন্দু ধর্মের মহাবাক্য একমেবাদ্বিতীয়ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬:২:১) অর্থাৎ একত্ববাদ, যার মর্মার্থ হোল একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কাউকে হুকুমদাতা হিসাবে স্বীকার না করা। ব্রহ্মসূত্রতেও রোয়েছে একই ঘোষণা: "একম ব্রহ্মা দ্বৈত্য নাস্তি নহিনা নাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ ঈশ্বর এক, তাঁর মত কেউ নেই, কেউ নেই, সামান্যও নেই (There is only one God, not the second; not at all, not at all, not in the least bit.)।

আর পবিত্র কোর'আন বোলছে: সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের পালন কর্তা আল্লাহর জন্য। (সুরা ফাতিহা-১),

আর ঋগবেদ বোলছে, সমস্ত প্রশংসা এই পৃথিবীর স্রষ্টার জন্য। (মণ্ডল ৫,সুক্ত ৮১ শ্লোক ১)

কোর'আন বোলছে, হে প্রভু! আমাদেরকে সরল সহজপথ প্রদর্শন করুন (সুরা ফাতিহা-২)

যজুর্বেদ বোলছে, আমাদের উপকারার্থে আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন। (সুক্ত ৪০, শ্লোক ১৬)

কোর'আন বোলছে, নভমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন খাঁটি বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (সুরা বাকারা -১০৭)

ঋগবেদ বোলছে, আকাশমণ্ডলী এবং মহাবিশ্বের মালিক হে পরমেশ্বর আমাদের সাহায্য করুন। (১-১০০-১)

কোর'আন বোলছে, যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন। (সুরা তাগাবুন-২)।

ঋগবেদ বোলছে -ঈশ্বর দানকারীর জীবিকা বা প্রাপ্য বৃদ্ধি করে দেন। (১-৮৪-৭)

কোর'আন বোলছে, তিনি আহার্য দান করেন কিন্তু কেউ তাকে আহার্য দান কোরতে পারে না। (সুরা আনআম-১৪)

ঋগবেদ-পরমাত্মা পানাহার করেন না। তিনি সৃষ্টির পানাহারের ব্যবস্থা করেন। (১-১৬৪-২০)

কোর'আন বোলছে, আল্লাহ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। (সুরা কাফ-১৬)

ঋগবেদ বোলছে, হে প্রভু, তুমি আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও রক্ষাকারী। (৫-২৪-১)

বেদের বহু শ্লোক আছে যার সঙ্গে কোর'আনের আয়াত ও রসুলাল্লাহর বহু হাদিসের মর্মার্থ হুবহু মিলে যায়। যেমনঃ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদের লেনদেন, ব্যভিচার, যৌতুক নিয়ে বিয়ে এসলাম এবং সনাতন উভয় ধর্মেই নিষিদ্ধ। উভয় ধর্মই নারী ও পুরুষকে শালীন পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেয় এবং অশ্লীল পোশাক পরিধানকে নিষিদ্ধ করে। বেদ এবং পবিত্র কোর'আন যে একই স্রষ্টার প্রেরিত ঐশীগ্রন্থ তা প্রমাণের জন্য এরকম আরো অসংখ্য সাদৃশ্য আমরা দেখাতে পারি। সনাতন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে এসলামের সামঞ্জস্য নিয়ে বহু গবেষণাগ্রন্থ রচিত হোয়েছে; আমরা সেদিকে যাবো না। স্রষ্টার প্রথম অবতার এবং প্রথম মানব আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে হাজার হাজার মহামানবের পদধূলিতে পবিত্র এই ভারতবর্ষ। মনু, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ (আ:) এদের সকলেই ছিলেন আল্লাহর নবী। মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ হিসাবে পরিগণিত বৈবস্বত মনুই হোচ্ছেন হিন্দুধর্মের মূল প্রবর্তক, কোর'আনে, বাইবেলে এবং ভবিষ্যপুরাণে তাঁকে নূহ নামে অভিহিত করা হোয়েছে। 'মনুহ' আর 'নুহ' মূলত একই শব্দ। আল্লাহর প্রথম কেতাব বেদের মূল অংশ তাঁর উপরই অবতীর্ণ হয় বোলে অনেকে মনে করেন। [মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী রচিত Now or Never] তাঁর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনে সকল মানুষ মারা যায়, কেবল তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা একটি নৌকায় আরোহণ কোরে জীবনরক্ষা করেন। তাঁরা প্রতিটি প্রাণীর এক জোড়া কোরে নৌকায় তুলেছিলেন। এই ঘটনাগুলি কোর'আন, বাইবেল, সনাতন ধর্মশাস্ত্রে প্রায় একইভাবে বর্ণিত আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে সনাতন ধর্ম আর এসলাম একই উৎস অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহর দেওয়া শাস্ত্র-বিধান দিয়ে যতদিন রাষ্ট্র পরিচালিত হোয়েছে ততদিন মানুষ ভোগ কোরেছে অনাবিল শান্তি।

রামরাজত্ব এবং এসলামের স্বর্ণযুগ

বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রাম প্রায় দশ হাজার বছর আগে ভারত শাসন কোরতেন বোলে শাস্ত্রজ্ঞরা মনে করেন। তাঁর জীবন, মহিমা এবং শিক্ষা আজও মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত আছে এবং তাঁর সুকীর্তিগাঁথা নিত্য আলোচিত হোচ্ছে। অযোধ্যারাজ রাম ব্যতীত এত প্রাচীন কোনো নৃপতির জীবনকাহিনী খুব কমই কীর্তিত হয়। "রামরাজ্য" শব্দটির মধ্যে বর্তমানে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পেলেও প্রকৃতপক্ষে শান্তিময় পৃথিবীর সমার্থক হিসাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র এ শব্দটি বাগধারা হিসাবে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। বর্তমানে এ শব্দটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় এমন কি নির্বাচনী এশতেহারেও। তারা অনেকেই একবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে রামরাজ্যে পরিণত কোরতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। সনাতন ধর্মবিশ্বাসমতে কলিযুগের অন্তে আরেকবার সত্যযুগের আবির্ভাব হওয়ার কথা। অনেক ভারতীয় জ্যোতিষ ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছেন যে সে সময় অত্যাসন্ন। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হোচ্ছে ১০ হাজার বছর পরও রামরাজত্বের ন্যায় একটি শান্তিময় রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষের কাছে অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। রামায়ণের বর্ণনামতে, রামরাজ্যে বাঘ ও ছাগল একসঙ্গে জলপান কোরত। সমস্ত মানুষ কেউ কারও শত্রু ছিল না। সবাই ধর্মের বিধান সম্পর্কে জানতো, ধর্ম কেবল পুরোহিতদের কুক্ষীগত ছিল না। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না। রাজ্যের নামই হোয়েছিল অযোদ্ধা অর্থাৎ যেখানে কোন যুদ্ধ নেই। শিক্ষকের মর্যাদা ছিলো সবার উর্ধ্বে। শাস্ত্রের শিক্ষা হোচ্ছে, "রাজা যদি দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কষ্টগুলির অভিজ্ঞতা লাভ না করে, তাহোলে সে কখনোই ভাল শাসক হোতে পারবে না।" এই জন্য রামচন্দ্র আর লক্ষণ অতি দূরবর্তী স্থানেও পায়ে হেঁটে চলাচল কোরেছেন, ঘোড়ায় বা রথে চড়ে যান নি। কেবল মানুষ নয়, পশুও তার অধিকার ভোগ কোরত, তাদের প্রতি কেউ কোন অন্যায় কোরলে বা তারা কোন ক্ষতির আশঙ্কা কোরলে রাজার দরবারে গিয়ে

হাজির হোত। শাস্ত্রে বলা ছিলো, রাজাই প্রজার দুঃখ-কষ্টের কারণ। তাই প্রতিটি মানুষ তাদের জীবনে যে কোন দুঃখ দুর্দশা আসলে তারা সরাসরি রাজার কাছে জবাব চাইতো। একজন মানুষও অপঘাতে মোরত না। প্রতিটি মানবশিশু হোত সুন্দর। প্রতিটি মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ কোরত। মহামূল্যবান রত্ন, মণি-মাণিক্যও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হোত, নারী-পুরুষ উভয়েই প্রচুর অলঙ্কার পরিধান কোরত। থালা বাসন তৈরি করার জন্য কেবল স্বর্ণই ব্যবহৃত হোত।

এই শান্তি প্রকৃতির উপরও প্রভাব বিস্তার কোরেছিল। প্রকৃতি গাছপালা ফুলে ফলে পরিপূর্ণ ছিল। বছরের বারো মাসেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হোত। যখন যেখানে বৃষ্টি দরকার তখন সেখানে বৃষ্টিপাত হোত, যেখানে দরকার নেই সেখানে কখনও বৃষ্টিপাত হোত না। সূর্য কখনোই মানুষের জন্য কষ্টদায়ক অবস্থা সৃষ্টি কোরত না। সবসময় নির্মল বাতাস মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হোত। এই ছিলো রামরাজ্য (দেখুন: স্বামী করপাত্রী মহারাজ এর 'মার্কসবাদ ও রামরাজ্য')।

"রামরাজ্য" শব্দটি আজ একটি সাম্প্রদায়িক শব্দে পরিণত হোয়েছে অথচ মহাত্মা গান্ধী বোলেছিলেন, "দেশ স্বাধীন হোলে রামরাজত্ব ফিরে আসবে।" তিনি বলেন, "Let no one commit the mistake of thinking that Ram Rajya means a rule of Hindus. My Ram is another name for Khuda or God. I want Khuda Raj which is the same thing as the Kingdom of God on Earth." অর্থাৎ কেউ যেন ভুলেও না ভাবে যে রামরাজ্য মানে হিন্দুর শাসন। রাম খোদা বা ঈশ্বরের অপর নাম। আমি প্রকৃতপক্ষে চাই খোদারাজ যা পৃথিবীর বুকে ঐশ্বরিক রাজত্বের নামান্তর। (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)

দেশ স্বাধীন হোয়েছে কিন্তু রামরাজ্য আসে নি। উপরন্তু পশ্চিমা প্রভুরাষ্ট্রগুলির ইন্ধনে আমরা আজও ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা কোরে যাচ্ছি, রাজনীতির নামে হানাহানি কোরে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্তাক্ত কোরছি। তবুও শেষ আশ্রয় হিসাবে সেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রেরই বন্দনা কোরে যাচ্ছি। আর কত মানুষ মরলে, আর কত রক্ত ঝরলে আমাদের বোধদয় হবে যে, এটা শান্তির পথ নয়?

স্রষ্টা যুগে যুগে তাঁর বার্তাবাহকদেরকে পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে প্রতিটি ভাষাভাষী মানুষের কাছে প্রেরণ কোরেছেন (সূরা এব্রাহীম-৫)। তাঁদের কাছে যে বিধান তিনি দিয়েছেন সেটা ঐ সময়ের ঐ এলাকার মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বিধবাদেরকে সূর্যোদয়ের সময় স্নান কোরতে হয়। এই বিধান ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় মেনে চলা গেলেও মরু বা মেরু অঞ্চলে কি মানা সম্ভব? সুতরাং সে অঞ্চলগুলিতে আল্লাহ অবশ্যই ভিন্ন বিধান দিয়েছেন। কিন্তু বিধানের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রভেদে

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের সময় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে। তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতা কোরে সহিংসতা নিরসনের জন্য নোয়াখালী সফরে আসেন মহাত্মা গান্ধী।

কিছুটা তারতম্য হলেও ধর্ম কিন্তু আলাদা নয়। সকল নবী-রসুল-অবতারদের মূল কথা একটাই- একমেবাদ্বীতিয়ম, কেবলমাত্র একজনের বিধানই আমরা মানবো। নবীদের বিদায় নেওয়ার পর তাঁদের অনুসারীদের মধ্য হোতে অতি ভক্তিবাদী শয়তান প্রকৃতির মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মের বিধানকে বিকৃত কোরে ফেলেছে, আল্লাহর বিধানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনগড়া বিধানও প্রবেশ কোরিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে সৃষ্টি হোয়েছে দলাদলি, মতভেদ। এভাবে ধর্ম দূষিত হোয়ে সাধারণ মানুষের জন্য নিপীড়নের কলে পরিণত হোয়েছে। এ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসুলগণকে কেতাব ও ন্যায়নীতিসহ প্রেরণ কোরেছেন যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে (সুরা হাদিদ ২৫)।" সনাতন ধর্মমতে এটাই হোচ্ছে অবতার আগমনের উদ্দেশ্য। পবিত্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে বোলছেন:

হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজে শরীর ধারণ কোরে অবতীর্ণ হই। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হোয়ে সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন কোরি। শ্রীগীতা ৪:৭/৮।

কিন্তু যখনই কোন নতুন অবতার আল্লাহ পাঠিয়েছেন, পুরাতন ধর্মের পুরোহিতরা তাদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হোয়েছেন। তাদের কারণে অনেক মানুষ নতুন অবতারদের চিনতে পারে নি, তারা তাদের বাপ-দাদার বিকৃত ধর্মকেই ধারণ কোরে থেকেছে। ফলে সৃষ্টি হোয়েছে নতুন একটি ধর্ম। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ এসে যখন সনাতন ধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হোলেন, তখন ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হয়। বুদ্ধ তাঁর সকল শিক্ষাকে চূড়ান্ত বা চিরকালীন বোলে মানতেন না, তিনি তার শিক্ষার অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি বোলেছিলেন, 'আমার উপদেশিত ধর্ম নৌকার মত, পারে পৌঁছানোর জন্য, ঘাড়ে করে বয়ে চলার জন্য নয়' (মজঝিম নিকায়)। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "যীশুখ্রিস্ট ইহুদি ছিলেন ও বুদ্ধদেব হিন্দু ছিলেন। বুদ্ধদেব নতুন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মতো তিনিও পূর্ব ধর্মমতকে পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই।" [১৮৯৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা]।

এভাবেই মানবসভ্যতা হাজারো বিবর্তনের মধ্যে চোলতে চোলতে এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হোল যখন পৃথিবীর জনপদগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হোল, তাদের মানসিক অগ্রগতি এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছালো যে তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব, তখন আল্লাহ শেষ অবতার হিসাবে পাঠালেন মোহাম্মদকে (দ:)। তাঁর সঙ্গে আল্লাহ দিলেন এমন একটি প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা যা পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তাঁকে দায়িত্ব দিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতিকে শেষ জীবনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসতে। এ জন্য তাঁকে অনেক যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে। তিনিই হোচ্ছেন কলিযুগে বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কল্কি অবতার। সনাতন ধর্মগ্রন্থে তাকে 'মায়াপ্রবর্তিনম' বা ধর্ম সংস্কারক, মরুস্থল নিবাসিনম, নরাশংস, কীরি, মামহ ঋষি, অন্তিম ঋষি, মহাজন, জগদগুরু ইত্যাদি গুণবাচক নামে অভিহিত করা হোয়েছে। কল্কি পুরাণে তাঁর সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের একটি শ্লোকে তাঁর পবিত্র নাম 'মোহাম্মদ' পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

এতস্মিনন্তিরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিত।।
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম।
চন্দনদিভির ভার্চ্যা তুষ্টাব মনসা হরম।।

-(৩ ঃ ৩ ঃ ৩, ৫-৮ শ্লোক)

যেখানে বলা হোয়েছে যে, যথাসময়ে 'মহমদ' নামে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন, যাঁর জন্ম হবে আচার্য পরিবারে, যাঁর নিবাস 'মরুস্থলে', সাথে স্বীয় সহচরবৃন্দও থাকবেন। হে মরুর প্রভু! হে জগতগুরু। আপনার প্রতি আমাদের স্তুতিবাদ।" শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ:) মরুভূমির দেশ আরবেই এসেছেন এবং তাঁর পিতৃবংশ কোরায়েশ ছিল আরবের আচার্য অর্থাৎ পুরোহিত বংশ। সামবেদে রসুলাল্লাহর 'আহমদ' নামটি সরাসরি আছে।

অহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ।
অহং সূর্য ইবাজনি॥

সামবেদ: ঐন্দ্রকাণ্ড, মন্ত্রঃ (১৫২)

বলা হোয়েছে, আহমদ প্রভুর নিকট হোতে জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ (মেধামৃত) লাভ কোরেছেন। বিশ্বজগত যেমন সূর্যের নিকট হোতে আলোক লাভ করে, তেমনি বিশ্বমানব তাঁর নিকট থেকে জ্যোতি লাভ কোরেছে।" অর্থাৎ তিনি কোন আঞ্চলিক নবী নন, সমস্ত মানবজাতির নবী (সুরা সাবা ২৮), সমগ্র বিশ্বমানবকে আলো দেওয়ার জন্য যিনি এসেছেন। এজন্য আল্লাহ তাঁকে সিরাজুম মুনিরা বা উজ্জ্বল আলোকময় প্রদীপ বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন (সুরা আহযাব ৪৬)। পুরাণে এও বলা আছে,

আশ্বমাশু গারুহ্য দেবদত্তং জগৎ পতিঃ।
অসিনাসাধু দমন মষ্টৈশ্বার্য গুণান্বিতঃ।

(ভাগবত পুরাণ-১২:২:১৯)

কল্কি অবতার দেবতা প্রদত্ত অশ্বে আরোহণ করিবেন এবং তরবারি দ্বারা দুষ্টের দমন করিবেন। এসব বর্ণনা অবলম্বনে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে কল্কি অবতারের মূর্তি চিত্রিত বা ক্ষুদিত আছে যাতে কল্কী অবতারকে বীর বেশে একটি সাদা ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় দেখানো হোয়েছে। আল্লাহর শেষ রসুল দেবতাদের সর্দার জিব্রাঈল এর আনীত একটি সুন্দর সাদা ঘোড়ায় মেরাজ ভ্রমণ কোরেছিলেন। এছাড়াও তাঁর প্রিয় প্রাণী ছিল ঘোড়া। তাঁর সাতটি ঘোড়া এবং নয়টি তরবারি ছিল।

আল্লাহর শেষ রসুল এবং তাঁর জাতি কঠোর সংগ্রাম কোরে ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্ধ পৃথিবীতে ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরতে সক্ষম হোয়েছিলেন। তারপরে আবারও ঘোটলো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তাঁর জাতির মধ্যেও প্রবেশ কোরল বিকৃতি। ফলে তারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ কোরে রাজা বাদশাহ হোয়ে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপন কোরতে লাগলেন। কিন্তু জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ আইন, কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি আল্লাহরটাই মোটামুটি চালু রাখলেন। আল্লাহর দেওয়া এই জীবনব্যবস্থার নিশ্চিত ফলাফল হোচ্ছে অনাবিল শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি, প্রগতি, জীবনের প্রতি অঙ্গনের ন্যায় ও সুবিচার। আল্লাহর রসুল যে সনাতন ধর্মেরই প্রবর্তক ছিলেন এবং তিনি যে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই কল্কি পুরাণে, যেখানে বলা হোচ্ছে,

শশ্বৎ সৈন্ধববাহনো দ্বিজজনিঃ কল্কিঃ পরাত্মা হরিঃ
পায়াৎ সত্যযুগাদিকৃৎ স ভগবান্ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রিয়ঃ

কল্কিপুরাণ (১:৩)

"যিনি উচ্চবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সিন্ধুজাত অশ্বে আরোহণপূর্বক সেনানী হইয়া সত্যযুগের সৃষ্টি করিবেন, সেই সনাতন ধর্মপ্রবর্তক পরমাত্মা ভগবান্ কল্কিরূপী হরি সকলকে রক্ষা করুন।"

সত্যিই তখন অর্ধপৃথিবীতে কোনো লোক এমন কি একটি কুকুরও না খেয়ে থাকতো না। সম্পদের এমন প্রাচুর্য তৈরি হোয়েছিলো যে, দান গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেতো না। সেই পরিবেশ সম্পর্কে অথর্ববেদের ভবিষ্যদ্বাণী হোচ্ছে:

(পরিচ্ছিন্নঃ ক্ষেমমকরেনৎ তম আসনমাচরন্।
কুলায়ন্ কৃণ্ব কৌরব্যঃ পতির্বদতি জায়য়া।
কতরৎ ত আ হরাণি দধি মন্থাং পরিশ্রুতম্।
জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছাতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞ পরিক্ষিতঃ।)

(অথর্ববেদ, কুন্তাপ সুক্তানি)

"সেই রাজর্ষির রাজত্বে এমন শান্তি বিরাজ কোরবে যে, একজন কুলবধূও বাজার থেকে দিবারাত্রি যে কোন সময়ে দধি ক্রয় কোরে আসতে সক্ষম হবে। জনমানব ও পশু সকলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে।"

বাস্তবেও তাই হোয়েছিল। একজন যুবতী মেয়ে সমস্ত গায়ে অলংকার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম কোরতে পারতো, তার মনে কোন ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হোত না। ঘুমানোর সময় মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ কোরত না। আদালতে মাসের পর মাস 'অপরাধ সংক্রান্ত' কোন অভিযোগ আসত না। নামাজের সময় মানুষ স্বর্ণের দোকান খোলা রেখে মসজিদে চোলে যেত, কেউ সেগুলো চুরি কোরত না। মক্কা ও মদিনায় এই অবস্থা আজও মোটামুটি আছে বোলে অনেকেই তাদের আত্মজীবনীতে লিখেছেন।

[ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় রচিত বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও মোহাম্মদ (দ:), ড. সিরাজুল ইসলাম এর স্মৃতির পাতা থেকে]

আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থার প্রভাবে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পরোপকার, মেহমানদারী, উদারতা, ত্যাগ, দানশীলতা, ওয়াদারক্ষা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মানুষের চরিত্র পূর্ণ হোয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত এসলাম আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বর, কলহবিবাদে লিপ্ত, অশ্লীল জীবনাচারে অভ্যস্ত জাতিটিকেই এমন সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিল যে তারা অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর সকল জাতির শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হোয়েছিল। এটাই হোচ্ছে পৃথিবীর বুকে সর্বশেষ শাস্ত্রের শাসন ও সত্যযুগ।

প্রকৃত সনাতন ধর্মের পুনরাবির্ভাব

কিন্তু বর্তমান অবস্থা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। হিন্দুরা যেমন বহু আগেই মনু-কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরদের (আ:) শিক্ষা পরিত্যাগ কোরেছে, ইহুদিরা মুসা (আ:) এর শিক্ষাকে পরিত্যাগ কোরেছে, খ্রিস্টানরা ঈসা (আ:) এর শিক্ষাকে পরিত্যাগ কোরেছে তেমনি মুসলমানরাও কোর'আনের শিক্ষা, রসুলের আদর্শ পরিত্যাগ কোরেছে। তারা সবাই মিলে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ

সনাতন ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক নির্মিত কল্কি অবতারের ভাস্কর্য যা ভারতের একটি মন্দিরে রক্ষিত আছে।

কর্নেল হুপারের ক্যামেরায় মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষপীড়িত একটি পরিবারের ছবি। বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের সর্বত্রই তখন একই চিত্র। ব্রিটিশ সরকার খাদ্যশস্য গুদামজাত করে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানি করে তাদের ২০০ বছরের শাসনামলে ৩ কোটি ভারতবাসীকে না খেয়ে মরতে বাধ্য করেছিল।

কোরে এখন দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র বস্তুবাদী, স্রষ্টাহীন, নৈতিকতাহীন জীবনব্যবস্থা আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি দিয়ে তাদের জীবন পরিচালনা কোরছে। যার পরিণামে গোটা দুনিয়া একটি নরকে পরিণত হোয়েছে। এক দিক দিয়ে মানুষ যেমন বিজ্ঞানের শিখরে উঠছে অপর দিক দিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সে সব রকমের অন্যায়ের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বাঁচার একটি মাত্র পথ স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। সেই জীবনব্যবস্থা কোথায় পাওয়া যাবে?

এসলামসহ পূর্বের সকল ধর্মকেই বিকৃত কোরে ফেলেছে ধর্মব্যবসায়ীরা। আমরা সুস্পষ্ট কোরে বোলতে চাই, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে এসলাম চোলছে সেটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রসুলের এসলাম তো নয়ই, সেটি প্রকৃত এসলামের ঠিক বিপরীত একটি ধর্মবিশ্বাস মাত্র। প্রকৃত এসলাম হারিয়ে গেছে ১৩০০ বছর আগে। বিকৃত হোয়ে যাওয়ার কারণেই এই প্রচলিত এসলাম মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না। অথচ এসলাম শব্দের অর্থই শান্তি। এসলামের প্রকৃত রূপরেখা আল্লাহ এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা হেযবুত তওহীদ বিকৃত এসলামকে প্রত্যাখ্যান কোরেছি এবং আল্লাহর প্রকৃত এসলামের রূপরেখা মানবজাতির সামনে তুলে ধরার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এসলামকে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বোলেছেন দীনুল কাইয়্যেমাহ (সুরা ইউসুফ ৪০, সুরা বাইয়্যেনাহ ৫, সুরা রুম ৩০, ৪৩)। যার অর্থ হোচ্ছে সনাতন ধর্ম, যে ধর্ম অপরিবর্তনীয়, আদি, শাশ্বত, চিরন্তন। মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন তার মৌলিক বিষয়গুলি কোনোদিন পরিবর্তিত হয় নি। এ জন্য এই ধর্মের নাম স্রষ্টা দিয়েছেন সনাতন ধর্ম যার শেষ সংস্করণ এসলাম। কিন্তু আজ ধর্মব্যবসায়ীরা জাতিদ্বয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এই বিদ্বেষকে কাজে লাগাচ্ছে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলি এবং তাদের ভাবাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলি। তারা ক্ষমতা ও ভোটের স্বার্থে আমাদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে রাখে। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ শাসন কোরেছে তাদের শাসন নীতিই ছিল ডিভাইড এন্ড রুল অর্থাৎ ঐক্যহীন কোরে শাসন করো। এ লক্ষ্যে তারা শিক্ষাব্যবস্থা, পত্র-পত্রিকা, ইতিহাস বিকৃতি, ইতিহাস রচনা, দেশি-বিদেশি দালালদের সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এমন বিদ্বেষ সৃষ্টি

কোরেছে যে ব্রিটিশ আমলেই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একে অপরের রক্তে হাত রাঙিয়েছে। সাতশত বছর মোসলেমরা এই ভারতবর্ষ শাসন কোরেছে, এই দীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ অনেক হোয়েছে কিন্তু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার একটি উদাহরণও নেই। বরং মুসলিম শাসনামলেই ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরে আরোহণ কোরেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে যারা এই ভারতবাসীকে শাসন কোরেছেন তারা যে প্রকৃত মুসলিম ছিলেন তা নয়, প্রকৃত এসলাম হারিয়ে গেছে রসুলাল্লাহর বিদায় নেওয়ার ৬০/৭০ বছর পরেই। এরপর এসলামের বিধান চালু থাকলেও তার আত্মা হারিয়ে যেতে আরম্ভ করে। তবু অর্ধ-পৃথিবীতে স্রষ্টার দেওয়া বিধানের ও রসুলাল্লাহর শিক্ষার সামান্য যেটুকুই অবশিষ্ট ছিল তার প্রভাবে ঐ অঞ্চলে সৃষ্টি হোয়েছিল অনাবিল শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি। ভারত শাসনকারী মুসলিম বংশোদ্ভূত সুলতনরা প্রকৃত এসলামের খলিফাদের মত ন্যায়নিষ্ঠ না থাকলেও নিজেদের মেধা, শ্রম সবকিছুকে উজাড় কোরে তারা ভারতীয় সভ্যতাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতায় পরিণত কোরেছিলেন, ভারতবর্ষকে ইংরেজদের পদানত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তারা শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ কোরে এদেশের বুকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কোরেছেন। তারা কোনদিন এদেশের সম্পদ অন্য দেশে পাচার করেন নি। পক্ষান্তরে ইংরেজ দস্যুরা ভারতবর্ষের সেই প্রাচুর্যের লোভে পড়েই এসেছিলো। তারা দুই শ' বছর ধোরে ভারতের সকল সম্পদ নিংড়ে নিয়ে চোলে গেছে নিজেদের দেশে। তাদের সময় তিন কোটি ভারতবাসী না খেয়ে করুণ মৃত্যুবরণ কোরেছিল। অথচ আমরা ভুলেই গেছি যে, আমাদেরই পূর্বপুরুষের রক্তে তাদের পতাকা হোয়েছে রক্তরাঙা, আমাদেরই অস্থি-পিঞ্জরের শুভ্রতা তাদের পতাকায় এঁকেছে আল্পনার রেখা।

স্রষ্টা কি পূজার কাঙাল?

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, স্রষ্টা উপাসনালয়ে থাকেন না। স্রষ্টা আর্ত-পীড়িত, নির্যাতিত মানুষের ক্রন্দন শুনে ব্যথিত হন। অথচ, ধর্মব্যবসায়ীরা এই নির্যাতিত মানুষের দায়িত্ব শয়তান, অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মসজিদ, মন্দির, গির্জায়, প্যাগোডায় ঢুকেছেন। তারা অর্থ উপার্জনের জন্য ধর্মকে উপাসনা, পূজা প্রার্থনার বস্তুতে পরিণত কোরেছেন, ধর্মগুলিকে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা আর প্যাগোডার চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী কোরে রেখেছেন। অথচ সকল ধর্মের মত সনাতন ধর্মেও ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, নামাজ রোজা, উপবাস, পূজা অর্চনা ধর্মের মূল কাজ নয়। ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য শান্তি। ওঙ্কার ধ্বনীর অর্থ শান্তি, এসলাম অর্থও শান্তি। পৃথিবী যখন অশান্তির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হোয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, মসজিদ/মন্দির থেকে জুতা চুরি হয়, যে সমাজে চার বছরের শিশু ধর্ষিত হয় সেখানে যারা মসজিদে গিয়ে মনে করে এবাদত কোরছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করে যে উপাসনা কোরছেন, মক্কা-গয়া-কাশিতে গিয়ে মনে করেন দেবতা বুঝি স্বর্গ থেকে তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি কোরছেন, তারা বিরাট ভ্রান্তির মধ্যে আছেন। মানবতার উপরে উপাসনার গুরুত্ব প্রদান একপ্রকার ভারসাম্যহীনতা যা দূর করার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নতুন অবতার পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বোলেছেন, "পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ স্রষ্টার উপর, মহাপ্রলয়ের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের অর্থাৎ অবতারদের উপর ঈমান আনবে, আর স্রষ্টাকে ভালোবেসে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে (সুরা বাকারা ১৭৭)। আর সনাতনধর্মে মানবসেবাকেই বলা হোয়েছে নর-নারায়ণ সেবা। তাহোলে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহোলে কি উপাসনার প্রয়োজন নেই? হ্যাঁ উপাসনার প্রয়োজন আছে। যারা মানুষের শান্তির জন্য কাজ কোরবে তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপাসনা। কিন্তু ধর্মজীবীরা এই সহজ সত্যকেও আড়াল কোরে রেখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বোলেছিলেন, "কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সে অধিক ধার্মিক। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় জানুক বা না জানুক সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থকে, সে যদি চিতা বাঘের মতো সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। (রামেশ্বর-মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

যামানার এমামের আবির্ভাব এবং কালের দুয়ারে সত্যযুগের করাঘাত

এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী তাঁর লেখায় ভারতবর্ষে আগত অবতারদেরকে নবীদের নামের শেষে যেভাবে সম্মানসূচক "আলাইহে আস সালাতু আস সালাম" ব্যবহার করা হয় সেভাবে কৃষ্ণ (আ:), যুধিষ্ঠির (আ:) মনু (আ:), বুদ্ধ (আ:) বোলে অভিহিত কোরেছেন। সত্যের প্রকাশে তাঁর এই সাহসী ভূমিকার জন্য তাঁকে বিকৃত এসলামের ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হোতে হোয়েছে, মিথ্যা মামলার শিকারও হোতে হোয়েছে। ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ গঠনের পর তিনি তাঁর

বাড়িতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন, সেখানে তিনি আগতদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা নিজেদেরকে সনাতন ধর্মের অনুসারী বোলে দাবি করেন। কিন্তু আমি বোলছি যে, না। আপনারা প্রকৃত সনাতন ধর্ম থেকে বহু দূরে সোরে গেছেন। প্রকৃত সনাতন ধর্মের অনুসারী আমি।' কিভাবে তিনি প্রকৃত সনাতন ধর্মের অনুসারী তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর পরিচিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দেখা হোলে দুই হাত তুলে নমস্কার কোরতেন, তাদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে কোনরকম পার্থক্য কোরতেন না। তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ও আন্তরিক আচরণ কোরতেন। তিনি কোর'আন ও সনাতন ধর্মের গ্রন্থগুলি তাঁর বইয়ের আলমারিতে একই সঙ্গে রাখতেন। বোলতেন, 'এগুলি সবই আসমানী কেতাব, সবই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু মুসলমানরাও আজকে কোর'আনের মধ্যে নেই, হিন্দুরাও বেদের মধ্যে নাই।'

উপমহাদেশের ইতিহাসেও এমামুয্যামানের পূর্বপুরুষদের রোয়েছে বিরাট ভূমিকা। ১৫৭৬ পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাসহ বৃহত্তর গৌড়ের সুলতান। এদেশের শাসনে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষাবিস্তারে তাঁর এবং তাঁর পূর্বপুরুষের অবদান চিরস্মরণীয়। আমরা তাঁর পক্ষ থেকে আহ্বান কোরছি, আসুন, আমরা সত্যযুগ ফিরিয়ে আনি। মহাভারতে বলা হোয়েছে, "রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্যপালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয় ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্মসঞ্চার হয় না।" (কালী প্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০৭)। সুতরাং সত্যযুগের শান্তি ফিরিয়ে আনা এখন আমাদের একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, আপনারা ভাববেন না যে, আমরা কাউকে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট কোরতে চাই। কেউ আল্লাহর শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ:) কে এবং তাঁর উপর নাজেলকৃত পবিত্র কোর'আনকে বিশ্বাস কোরবেন কি কোরবেন না, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের কথা হোচ্ছে, আমরা যদি শান্তিতে জীবনযাপন কোরতে চাই, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিময় জীবন উপহার দিতে চাই তার জন্য আমাদেরকে সকল প্রকার কলহ বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলে একতাবদ্ধ হোতে হবে, এ কথা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন? এই যে ঐক্যবদ্ধ হবেন এটা কিসের ভিত্তিতে?

প্রথমত আমাদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান কোরতে হবে। ব্রিটিশরা দুইশ বছর আমাদের সম্পদ শোষণ কোরে নিজেদের দেশে জড়ো কোরেছে এবং আমাদেরকে নিঃস্ব জাতিতে পরিণত কোরেছে। যাওয়ার সময় তারা গণতন্ত্রের নামে এমন একটি স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে গেছে যেটা পালন করার ফলে আমরা চিরকাল হানাহানির মধ্যে লিপ্ত থাকবো এবং কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ হোতে পারবো না। এই জীবনব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিচ্ছে, আমাদেরকে আরও বেশি পাশ্চাত্যনির্ভর কোরেছে, সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থহীন কোরে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে এই কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে যে, মানুষকে শান্তি দিতে পারে কেবলমাত্র স্রষ্টার বিধান। সুতরাং আপনারা পশ্চিমাদের তৈরি জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে প্রকৃত সনাতন ধর্মের শিক্ষার দিকে ফিরে আসুন। সেখানে ফিরে গেলে দেখবেন আমি আপনি ভাই-ভাই। আমাদের স্রষ্টা এক, আমাদের পিতা-মাতা এক, আমাদের ধর্ম এবং অবতারগণ এসেছে একই স্রষ্টার কাছ থেকে। ধর্মের এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে সকল প্রকার সন্ত্রাস, হানাহানি, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে।

অতএব, আসুন আমরা খুঁজে বের কোরি কোন কোন বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল রোয়েছে, অমিলগুলো আপাতত সোরিয়ে রাখি। বিচ্ছেদের রাস্তা না খুঁজে সংযোগের রাস্তা খুঁজি। কোনো ধর্মই মানুষকে বিচ্ছেদের রাস্তা দেখায় না। সুতরাং আজকে যারা ধর্ম আর রাজনীতির নামে বিভেদের মন্ত্র শেখায় তারা আল্লাহর উপাসক নয়, তারা শয়তান অর্থাৎ আসুরিক শক্তির উপাসক। পশ্চিমা পরাশক্তিগুলি মনে করে আমরা তাদের জীবনব্যবস্থা এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। আমরা যদি ষোলো কোটি বাঙালি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হোই, তাহোলে তাদের এই ভুল ধারণা আমরা ভেঙ্গে দিতে পারবো। এবং শীঘ্রই আমরা বিশ্বের বুকে একটি সম্মানিত জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো এনশা'আল্লাহ। এজন্য আমাদেরকে বেদে স্রষ্টা মানুষকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে ধারণ কোরতে হবে।

হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও, পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম কর, জীবনের আনন্দে সম অংশীদার হও। একটি চাকার শিকগুলো সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে যেমন গতিসঞ্চার হয়, তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলেই অগ্রগতি অবধারিত। (অথর্ববেদ, ৩/৩০/৬-৭)

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

দক্ষিণ ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় সনাতনধর্মীদের একটি বড় ধর্মীয় উৎসব হোচ্ছে রাবন পূজা।

শিয়া-সুন্নী এক হোক বৈষ্ণব-শাক্তও এক হোক

মনিরুয্যামান মনির

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন বহু নবী-রসুল ও অবতারগণ। তাদের এবং তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত অসংখ্য মুনি-ঋষি-তাপসের পদধূলিতে গোটা ভারতভূমিই যেন এক বিরাট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হোয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে, জাগোরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

যুগে যুগে আগত সনাতন ধর্মের নানা সংস্কারকদের শিক্ষাকে কেন্দ্র কোরে এক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে বহু দল উপদল ও সম্প্রদায়। প্রতিটি দল নিজেদেরকে অন্য দলের তুলনায় সঠিক বোলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা এক ধর্মের অনুসারী হোয়েও ধর্মীয়ভাবে ও আত্মিকভাবে বিভক্ত। আমাদের দেশে শারদীয় দুর্গা পূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব, অথচ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ত্রিপুরা ইত্যাদি এলাকার বাইরে ভারতের বেশির ভাগ হিন্দুই দুর্গা পূজা করেন না। আবার উত্তর ভারতে যে রামকে (আ:) ঘটা করে পূজা করা হয় সেই রামকে কেন্দ্র কোরে এখানে কোন পূজা হয় না। মহারাষ্ট্রের লোকেরা পূজা করে গণপতি গণেশকে। এমনকি দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার হিন্দুদের বিরাট অংশ রাবণকেও পূজা করে। তাদের নিজ নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ কোরতে গিয়ে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় তারা বহু রক্ত ঝরিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে তারা কখনও এক হোতে পারেনি, এখনো পারছে না। কিন্তু সকল সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ের মানুষের একটিই কামনা, স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি। সেই স্রষ্টা কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, স্রষ্টা সমগ্র মানবজাতির। যেই তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে, তাঁর কাছে পথের সন্ধান করে স্রষ্টা তাকেই পথ দেখান। তিনি পবিত্র কোর'আনে বোলেছেন যে,

'আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা ১৮৬)।

সুতরাং কে কোন ধর্মের অনুসারী, কে কোন মাযহাব-ফেরকার অনুসারী সেটা আল্লাহ দেখেন না। সুতরাং যে যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহর হুকুম মান্য করা। এ কথাটিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বোলেছিলেন যে,

'যত মত, তত পথ। সব মতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাঁর কাছে ভক্তের কোন জাত-পাতের বিচার নেই। হিন্দু-

মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সবাই যে নামেই তাঁকে ডাকুক, সবই তাঁর কাছে পৌঁছায়।'

সকল মহাপুরুষই চান মানবজাতির ঐক্য, কারণ তারা জানেন যে ঐক্যের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। তা সত্ত্বেও ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি ধর্মকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে রাখার জন্য বিভিন্ন মনগড়া প্রথাকে ধর্মের মধ্যে প্রবেশ কোরিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রচারের গুণে হিন্দুধর্মের মধ্যে আচার-বিচার, জাত-পাত এবং ছোঁয়াছুঁয়িটাই প্রধান হোয়ে উঠেছে। মহামানবদের শিক্ষা বইয়ের পাতায় মুদ্রিত থাকলেও বাস্তবে হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত যেমন: বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও আছে নানা উপদল। এছাড়া আছে প্রাচীনকাল থেকে চলমান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, শুদ্র ইত্যাদি বর্ণভেদ। একত্ববাদী ব্রাহ্মরাও কম নয়। এতসব বিভক্তি বজায় রেখে একটি জাতি খুব বড় কিছু কোরতে পারে না। আজ আমরা এদেশের ১৬ কোটি বাঙালি পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলির চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেমের ফাঁদে পড়ে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি, অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার ইত্যাদির মধ্যে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশদের হাত থেকে আমরা স্বাধীন হোয়েছি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমরা স্বাধীন হই নি। ১৯৭১ সনে আবারও আমরা সবাই মিলে যুদ্ধ কোরে বাংলাদেশ লাভ কোরেছি কিন্তু যে জন্য এত সংগ্রাম অর্থাৎ অন্যায় অবিচারহীন একটি সমাজগঠন, সেটা কি আমরা কোরতে সক্ষম হোয়েছি? না। আমরা দিন দিন আরও বেশি কোরে পাশ্চাত্যের পদানত গোলামে পরিণত হোচ্ছি। এখন আমরা যদি নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারি তাহোলে এই ১৬ কোটি বাঙালি বিশ্বের বুকে এক বিরাট শক্তির অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে।

আল্লাহর শেষ অবতার মোহাম্মদ (দ:) আরবের গোত্রের সঙ্গে গোত্রের সংঘাত নিরসন কোরে, গোত্র, বর্ণ, বংশ, আভিজাত্য প্রথা নির্মূল করে বৃহত্তর জাতি গঠন করেছিলেন, সেও মুসলিমরাও মানব সৃষ্ট মতবাদের অনুসরণ আর ফেরকাবাজির কারণে শত শত ফেরকা মাজহাবে বিভক্ত। আমরা হেযবুত তওহীদ, যামানার এমামের অনুসারীরা চেষ্টা কোরে যাচ্ছি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষকে একটি মহাসত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ কোরতে যে, আপনারা সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই বাবা-মায়ের সন্তান। আপনারা যে যে ধর্মের অনুসারীই হোন না কেন, সব ধর্মই চায় মানুষ তার নিজের কল্যাণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হোক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলেছিলেন-

হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথে মুসলিমদের আচার-প্রথা বাধা নয়- বাধা তাদের ধর্ম, আর হিন্দুদের ধর্ম বাধা নয় বাধা হোচ্ছে আচার-প্রথা।

এর থেকে বুঝা যায় যে হিন্দু ধর্ম আচার সর্বস্ব ধর্ম। সে সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হোয়েছিল- তাহলে কি ভাবে ভারতে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য হবে? তিনি বোলেছিলেন- 'শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যমেই ভিতরের বাধা দূর কোরতে হবে।' আমরাও তাই বোলছি। একমাত্র সত্যের শিক্ষাই পারে জাত-পাত, আচার-বিচার, ধর্মাধর্ম ভুলে মানবজাতিকে এক কোরতে। সেই শিক্ষা কি ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষা? না। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিই হোল- ডিভাইড অ্যান্ড রুল। এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যই আমাদেরকে টুকরো টুকরো কোরে ভাগ কোরে ফেলা। তাদের দেওয়া স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন, বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থাই আজ মানুষকে পশুর চেয়ে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতে হোলে প্রকৃত সনাতন ধর্মের শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে হবে। আমরা চাই মুসলিমরা শিয়া-সুন্নী বিভেদ ভুলে একতাবদ্ধ হোক, হিন্দু-মুসলিম একতাবদ্ধ হোক, বৈষ্ণব-শাক্ত একতাবদ্ধ হোক, সনাতন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও যে ধর্মীয় মতান্তর রোয়েছে সেগুলি ভুলে গিয়ে তারা ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলির উপর একতাবদ্ধ হোক। আসুন, আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলি ১৬ কোটি আদমসন্তানের এক বিশাল ভ্রাতৃসমাজ।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

হিন্দু ধর্মের উপ-সম্প্রদায়

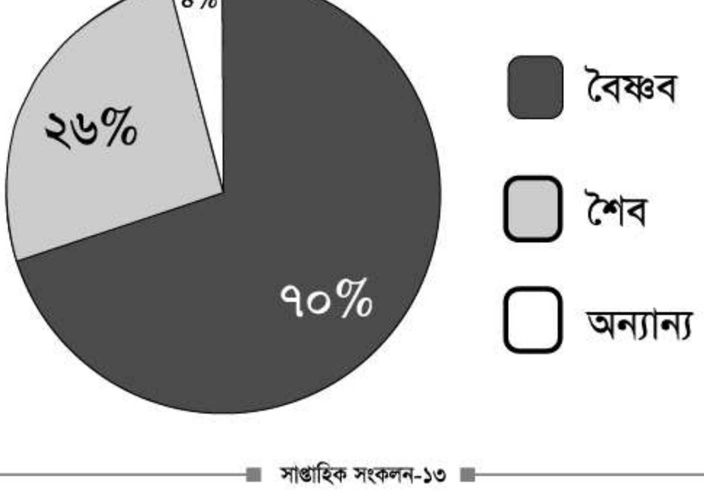

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

বিভিন্ন ধর্মে ফেরেশতা ও দেবদেবীর ধারণা

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থগুলি ও বিজ্ঞান একমত যে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে স্রষ্টা এই বিপুল বিশ্ব-জগত সৃষ্টি কোরেছেন। এই বিশাল সৃষ্টিকে তিনি প্রশাসন ও পরিচালনা কোরতেন এবং করেন তাঁর অসংখ্য মালায়েকদের দিয়ে যাদের আমরা বোলি ফেরেশতা- ফারসি ভাষায়, ইংরেজিতে Angel। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, প্রচলিত বিশ্বাস, পৌরণিক মিথ এবং ইতিহাসসহ যাবতীয় তথ্য উপাত্ত ইত্যাদি একত্র কোরে গবেষণা কোরলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, ভারতীয়, রোমান এবং গ্রীকরা যে দেব-দেবী gods, goddess বিশ্বাস করেন সেগুলো এবং মালায়েক বা ফেরেশতা একই জিনিস। সংখ্যায় এরা অগণ্য এবং এরা আসলে প্রাকৃতিক শক্তি, যে শক্তি দিয়ে আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন এবং এদের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। আল্লাহ যাকে যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, যাকে যে কর্তব্য নির্দ্ধারণ কোরে দিয়েছেন; সে ফেরেশতা সামান্যতম বিচ্যুতি না কোরে তা যথাযথ কোরে যাচ্ছেন। আসলে কোন বিচ্যুতি হোতে পারে না- কারণ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কোন স্বাধীন ইচ্ছাই নেই। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি মালায়েক। এর উপর স্রষ্টা কর্তব্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন সমস্ত কিছুকে আকর্ষণ কোরে ধোরে রাখার। সৃষ্টির প্রথম থেকে এই ফেরেশতা তার কর্তব্য কোরে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত কোরে যাবেন। তার এতটুকু ইচ্ছা শক্তি নেই যে, এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্যও তিনি এই কাজের বিরতি দেন, সে ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ তাকে দেন নি। এমনি আগুন, বাতাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলি- ফেরেশতা, দেব-দেবী, অন্যান্য ধর্মে যেমন দেব-দেবীরা কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির ভারপ্রাপ্ত, যেমন হিন্দু শাস্ত্রে বরুণ বাতাসের দেবতা, সূর্য একটি দেবতা- সূর্যদেব, গ্রীকদের নেপচুন সমুদ্রের, পানির দেবতা, রোমানদের ভালকান হোচ্ছেন আগুনের দেবতা, তেমনি এসলাম ধর্মেও বিভিন্ন কাজে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। আজরাইলকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের মৃত্যুর সময় এলে জান কবজ করার। এই ফেরেশতা ত্রুটিহীনভাবে তার দায়িত্ব পালন কোরে যাচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্যও তার সাধ্য নেই এই কাজ থেকে বিরত থাকার। সনাতন ধর্মে এই মৃত্যুদূতকে বলা হয় যমরাজ, জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মে বলা হয় মারিয়া। গ্রীক পুরাণে আকাশ ও বজ্রের দেবতা হোচ্ছেন দেবরাজ জিউসকে, আর বৈদিক ধর্মে দেবরাজ বলা হয় ইন্দ্রকে যার অস্ত্রও সেই বজ্র। এসলাম ও বাইবেল মতে মিকাইল (মাইকেল) নিয়োজিত বৃষ্টি ঝরানোর কাজে, বজ্রও তার নিয়ন্ত্রণে। এভাবে জিব্রাইল, এস্রাফিল, কেরামান-কাতেবিন তারাও অনবরতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন কোরে চোলেছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত/পালি ভাষায় এদের বোঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হোয়েছে দেব (Deva), দেবতা, দেবপুত্র ইত্যাদি। আরও ব্যাপারে মিল আছে। সব ধর্ম মতেই এরা সংখ্যায় বিশাল-স্বভাবতঃই, কারণ এই অসীম সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক শক্তিও অসংখ্য। ভারতীয় ধর্মগুলিতে এদের সংখ্যা ধরা হয় তেত্রিশ কোটি। সংস্কৃতে কোটি শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ ছাড়াও আরো অনেক অর্থ আছে। সংস্কৃতে কোটি শব্দের অর্থ হোল অনন্ত, চরম, অসংখ্য, অসীম, কল্পনা (বিশাল ধারণা)।

আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক শক্তিগুলিই এককেটি ফেরেশতা যাদেরকে সনাতন ধর্মে দেব দেবী বোলে বিশ্বাস করা হয়।

খ্রিস্টানরাও এদের সংখ্যা বলেন কোটির অংকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যাজক পণ্ডিত এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus) তো হিসেব কোরে (কেমন কোরে হিসাব কোরলেন আল্লাহই জানেন) বের কোরেই ফেললেন যে Angel অর্থাৎ ফেরেশতার সঠিক সংখ্যা হোচ্ছে উনচল্লিশ কোটি, নিরানব্বই লক্ষ, বিশ হাজার চার জন- হিন্দুদের চেয়ে সাত কোটির মত বেশি। জাপানের শিনটো ধর্মে দেব-দেবীর সংখ্যা আশী লক্ষ। মেরাজে যেয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) দেখেছিলেন যে, বায়তুল মামুর মসজিদে হাজার হাজার ফেরেশতারা একদিক দিয়ে ঢুকছেন, সালাহ কায়েম কোরে আরেক দিক দিয়ে বের হোয়ে যাচ্ছেন। তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বোলতে যেয়ে

তিনি বোলেছেন একবার যারা সালাহ্ কায়েম কোরে বের হোয়ে যাচ্ছে তাদের আর দ্বিতীয় বার সালাহ কায়েম করার সুযোগ আসবে না (হাদিস- আনাস (রাঃ) থেকে সাবেত আল বুতানী, মোসলেম, মেশকাত) অর্থাৎ অসংখ্য। অসীম সময় থেকে আল্লাহ তাঁর বিশাল সৃষ্টিকে তাঁর অসংখ্য মালায়েকদের (প্রাকৃতিক শক্তি) দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে প্রশাসন ও পরিচালনা কোরে আসছিলেন। তারপর এক সময়ে তাঁর ইচ্ছা হোল মানুষ সৃষ্টির। তাঁর এই ইচ্ছা কেন তা আমার জানা নেই। কারো জানা আছে কিনা তাও জানা নেই। তাঁর বাণীতে তিনি কিছু আভাস মাত্র দিয়েছেন। একবার বোলেছেন- এ সৃষ্টি আমি সময় কাটাবার জন্য কোরি নি (সুরা আল মুল্ক)। অবশ্যই- কারণ সময়ই যার সৃষ্টি তার আবার তা কাটাবার প্রশ্ন কোথায়? আবার বোলেছেন- তিনি পরীক্ষা কোরে দেখতে চান তোমাদের মধ্যে কারা ভালো কাজ করে (সুরা আল মুল্ক)। মোট কথা একমাত্র তিনিই জানেন, কেন তিনি এই বিশ্বজগৎ ও বিশেষ কোরে একাধারে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি কোরলেন (সুরা আত্ ত্বীন ৪-৫) কিন্তু এ সত্য এড়াবার উপায় নেই যে সৃষ্টি তিনি কোরেছেন। ঐ সময়টার কথা বোলতে যেয়ে তিনি কোর'আনে আমাদের যা বোলেছেন তা এই যে, যখন আল্লাহ তাঁর মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের বোললেন যে আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি কোরতে ইচ্ছা কোরেছি তখন তারা বোললেন- কী দরকার তোমার প্রতিভূ সৃষ্টি করার? ওরাতো পৃথিবীতে ফাসাদ, অশান্তি আর রক্তপাত কোরবে (কোর'আন-সুরা আল বাকারা ৩০)। মালায়েকদের এই উত্তরের মধ্যে নিহিত রোয়েছে সৃষ্টি রহস্যের একটা বড় অংশ। কাজেই এটাকে একটু ভালোভাবে বুঝে নেয়া যাক।

এসলাম, জুডিয় ও খ্রিস্টান ধর্মমতে আদমের (আঃ) এক ছেলে কাবিল আরেক ছেলে হাবিলকে হত্যা কোরেছিলো। ঐ প্রথম রক্তপাত থেকে যে রক্তপাত মানুষ জাতির মধ্যে শুরু তা আজ পর্যন্ত থামে নি। বরং এই অশান্তি ও রক্তপাত আজ পর্যন্ত মানুষজাতির জন্য সর্বপ্রধান সমস্যা হোয়ে আছে। শত চেষ্টা কোরেও, লীগ অব নেশনস কোরেও, কোটি কোটি মানুষের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই প্রায় সাড়ে আট কোটি আদম সন্তান জীবন হারায়। এদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটিই হোল বেসামরিক মানুষ। তৎকালীন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এই নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪ জন। পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ছিল এটি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। নতুন এই শতাব্দীতে যুদ্ধ-রক্তপাতহীন একটি দিনও অতিবাহিত হয় নি। এই শতাব্দীর শুরুতে শুধু এক ইরাকেই দশ লক্ষাধিক মানুষ যুদ্ধের বলি হয়। সামান্য পরিমাণ মানবতাবোধ না থাকার দরুন অবুঝ শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী মহিলারা পর্যন্ত এই সকল যুদ্ধের নৃশংসতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মানুষ শান্তিতে বসবাস কোরছে। যতই দিন যাচ্ছে মানবজাতি ততই ফাসাদ-সাফাকুদ্দিমার নতুন নতুন পর্ব অতিক্রম কোরে ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চোলেছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্যাই মানুষ জাতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে আজ তার অস্তিত্বই প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বসাকুল্যে একথা বলা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে মালায়েকরা যে যুক্তিগুলো আল্লাহর কাছে পেশ কোরেছিলেন তার প্রত্যেকটি বর্তমানে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হোচ্ছে।

আল্লাহ-মানুষ-এবলিস

ফেরেশতারা যে দু'টি শব্দ মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার কোরেছিলেন তার একটা ফ্যাসাদ, যার অর্থ অবিচার, অশান্তি, অন্যায় ইত্যাদি। অন্যটি রক্তপাত। দুটো মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় মানুষ অন্যায়, অশান্তি আর রক্তপাত কোরবে। সত্যই তাই হোয়েছে, আদমের (আঃ) ছেলে থেকে আজ পর্যন্ত শুধু ঐ রক্তপাতই নয়, অশান্তি, অন্যায়, অবিচারও বন্ধ হয় নি, এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানব জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই অন্যায়, অশান্তি, অবিচার আর রক্তপাত, যুদ্ধ- মানুষ শত চেষ্টা কোরেও বন্ধ কোরতে পারে নি। শুধু তাই নয়, এই সমস্যাই মানুষ জাতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে আজ তার অস্তিত্বই প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে **মালায়েকরা এ কথা বলেন নি যে মানুষ মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, প্যাগোডায়, সিনাগগে যেয়ে তোমার উপাসনা কোরবে না, উপবাস কোরবে না**। তারা এসবের একটাও বলেন নি। বোলেছেন অশান্তি, অন্যায়, ঝগড়া আর রক্তপাত কোরবে। অর্থাৎ আসল সমস্যা ওটা নয়, এইটা। আল্লাহ কি বোঝেন নি মালায়েকরা কী বোলেছিলেন? তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য কোরে মানুষ বানালেন। তারপর আল্লাহ আদমের দেহের মধ্যে তাঁর নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা আল হিজর ২৯)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, শব্দ ব্যবহার কোরেছেন আমার আত্মা, স্বয়ং স্রষ্টার আত্মা। অর্থাৎ আল্লাহর যত রকম গুণাবলী, সিফত আছে সব মানুষের মধ্যে চলে এলো। এমনকি তার যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এটাও ঐ আত্মার সঙ্গে মানুষের মধ্যে চলে এলো। আল্লাহর এই গুণ, এই শক্তিগুলি সৃষ্টির আর কারো নাই- ফেরেশতা, মালায়েকদেরও নেই- সব তাঁর বেধে দেওয়া আইন, নিয়ম মেনে চোলছে। এইগুলিকেই আমরা বলি প্রাকৃতিক নিয়ম। কারো সাধ্য নেই এই নিয়ম থেকে এক চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম করে। কারণ তা করার ইচ্ছাশক্তিই তাদের দেয়া হয় নি। ইচ্ছা হোলে কোরব, ইচ্ছা না হোলে কোরব না, এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি

একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা মানুষের মধ্যে ফুঁকে দেয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ লক্ষ কোটি সৃষ্টির আরেকটি মাত্র ছিলো। কিন্তু স্রষ্টার আত্মা তার মধ্যে ফুঁকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এক অনন্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হোয়ে গেলো। সে হোয়ে গেলো স্রষ্টার, আল্লাহর প্রতিনিধি যার মধ্যে রোয়েছে সেই মহান স্রষ্টার প্রত্যেকটি গুণ, শুধুমাত্র গুণ নয় প্রত্যেকটি শক্তি। শুধু তফাৎ এই যে, অতি সামান্য পরিমাণে। ব্যাখ্যা কোরতে গেলে বোলতে হয়- মহাসমুদ্র থেকে এক ফোঁটা পানি তুলে এনে তার যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যায় তবে ঐ এক ফোঁটা পানির মধ্যে সেই মহাসমুদ্রের পানির প্রত্যেকটি গুণ পাওয়া যাবে, মহাসমুদ্রের মধ্যে যত পদার্থ আছে তার প্রত্যেকটি পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু ঐ এক ফোঁটা পানি মহাসমুদ্র নয়-সে প্রলয়ংকর ঝড় তুলতে পারে না, জাহাজ ডোবাতে পারবে না।

দ্বিতীয় হোল:- স্রষ্টা তাঁর এই নতুন সৃষ্টিটাকে সব জিনিসের নাম শেখালেন (আল বাকারা ৩১)। এর অর্থ হলো তিনি যা সৃষ্টি কোরেছেন সেই সব জিনিসের ধর্ম (Property), কোন জিনিসের কি কাজ, কেমন কোরে সে জিনিস কাজ করে ইত্যাদি, এক কথায় বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি কোরে তিনি তাঁর বিশাল সৃষ্টি কোরেছেন, মানুষকে সেই বিজ্ঞান শেখালেন। এই কথা বোলে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, **মানুষ জাতি সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কোরবে।**

তৃতীয় হলো:- আল্লাহ তাঁর মালায়েকদের ডেকে হুকুম কোরলেন তাঁর এই নতুন সৃষ্টি আদম অর্থাৎ মানুষকে সাজদা কোরতে। এবলিস ছাড়া আর সমস্ত মালায়েক মানুষকে সাজদা কোরলেন (আল বাকারা ৩৪)। এর অর্থ কী? এর অর্থ প্রথমতঃ ফেরেশতারা মানুষকে তাদের চেয়ে বড়, বেশি উচ্চ বোলে মেনে নিলেন, কারণ তার মধ্যে আল্লাহর আত্মা আছে যা তাদের মধ্যে নেই। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আল্লাহ মানুষের খেদমতে নিযুক্ত কোরে দিলেন। আগুন, পানি, বাতাস, বিদ্যুৎ, চুম্বক, মাটি ইত্যাদি লক্ষ কোটি মালায়েক তাই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। একমাত্র এবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য কোরে আদমকে (আ:) সাজদা করলো না।

এবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য কোরতে পারলো কারণ মূলতঃ এবলিস ছিলো একজন জ্বীন- মালায়েক নয়। কঠিন এবাদত ও রেয়াযত কোরে পরে সে মালায়েকের স্তরে উন্নীত হয়। আগুনের তৈরি বোলে তার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি না থাকলেও অহঙ্কার তখনো বজায় ছিলো, যা সে অত সাধনা কোরেও নিশ্চিহ্ন কোরতে পারে নি। মাটির তৈরি আদমকে সাজদা কোরতে বলায় তার ঐ অহঙ্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো বোলেই সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিলো যে, তুমি যদি আমাকে এই শক্তি দাও যে আমি মাটির তৈরি তোমার ঐ সৃষ্টিটার দেহের, মনের ভেতর প্রবেশ কোরতে পারি তবে আমি প্রমাণ কোরে দেখাবো যে, ঐ সৃষ্টি তোমাকে অস্বীকার কোরবে। আমি যেমন এতদিন তোমাকে প্রভু স্বীকার কোরে তোমার আদেশ মত চলেছি, এ তেমন চোলবে না। আল্লাহ এবলিসের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরলেন। তাকে আদমের দেহ, মন, মস্তিষ্কে প্রবেশ কোরে আল্লাহকে অস্বীকার করার, তার অবাধ্য হবার প্ররোচনা দেবার শক্তি দিলেন (সুরা আল বাকারা ৩৬, সুরা আন নিসা ১১৯)।

এর পরের ঘটনাগুলো অতি সংক্ষেপে এই যে, আল্লাহ তার প্রতিভূ আদমের জন্য তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি কোরলেন, তাদের জান্নাতে বাস কোরতে দিলেন একটি মাত্র নিষেধ আরোপ কোরে। আল্লাহর অনুমতি পেয়ে এবলিস আদম ও হাওয়ার মধ্যে প্রবেশ কোরে তাদের প্ররোচনা দিয়ে ঐ একটিমাত্র নিষেধকেই অমান্য করালো, যার ফলে আল্লাহ তাদের জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নির্বাসন দিলেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সুরা আল বাকারা ৩৬) -অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত। আর বোললেন- **নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য পথ-প্রদর্শক পাঠাবো** (সুরা আল বাকারা ৩৮)।

প্রশ্ন হোতে পারে- যে মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন তাকে পথ-প্রদর্শন কোরতে হবে কেন? এই জন্য হবে যে মানুষ নিজে তার পথ খুঁজে নিজের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা তৈরি কোরে নিতে পারতো যদি কী কী প্রাকৃতিক নিয়মে এই সৃষ্টি হোয়েছে, চোলছে তার সবই যদি সে জানতো। কিন্তু তা সে জানেনা। দ্বিতীয়তঃ এবলিস তো তার মধ্যে বোসে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে প্ররোচনা দিয়ে চোলেছেই। তার চেয়ে বড় কারণ, ঐ এবলিসের চ্যালেঞ্জ- মানুষকে দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার কোরিয়ে, আল্লাহর দেয়া জীবন পথকে বর্জন কোরিয়ে নিজেদের জন্য জীবনব্যবস্থা তৈরি কোরিয়ে তাই মেনে চলা- যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অন্যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত। আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থা পাঠিয়ে বোলছেন আমাকে **একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিধানদাতা বোলে বিশ্বাস কোরে, এই জীবন ব্যবস্থা মত তোমাদের জাতীয়, পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা কর,** তাহোলে তোমাদের ভয় নেই (সুরা আল বাকারা ৩৮)। কিসের ভয় নেই? ঐ ফ্যাসাদ, অশান্তি, রক্তপাতের এবং পরবর্তীতে জাহান্নামের ভয় নেই। যে জীবনব্যবস্থা দীন আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে বার বার পাঠালেন- এর নাম, স্রষ্টা নিজে রাখলেন শান্তি, আরবি ভাষায় এসলাম। অর্থ - **এই দীন, জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা কোরলে তার ফল শান্তি, জাতীয়, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি, এসলাম। না কোরলে অশান্তি, অন্যায়, অবিচার মানুষে মানুষে যুদ্ধ, রক্তপাত**- মানুষ তৈরির বিরুদ্ধে মালায়েকরা যে কারণ পেশ কোরেছিলেন আল্লাহর কাছে। তাই সেই আদম (আ:) থেকে শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত যতবার নবীর মাধ্যমে এই জীবনব্যবস্থা তিনি পাঠালেন, সবগুলির ঐ একই নাম- এসলাম-শান্তি।

এসলামই সনাতন ধর্ম

আল্লাহ তাঁর প্রতিভূ আদমকে (আ:) সৃষ্টি কোরে তার স্ত্রীসহ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। বোলে দিলেন- যাও, ওখানে বংশ বৃদ্ধি কর। তোমরা ওখানে তোমাদের সামগ্রিক জীবন কেমন কোরে পরিচালিত কোরলে অন্যায়-অবিচার, রক্তপাতহীন অবস্থায় বাঁচতে পারবে সে পথ প্রদর্শন আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব। **অর্থাৎ মানুষকে শান্তিতে থাকতে হোলে যে রকম জীবন-ব্যবস্থায় থাকতে হবে সে ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার তিনি নিজে নিলেন।** স্রষ্টা যে কাজের দায়িত্ব নিলেন তাতে যে তিনি ব্যর্থ হবেন না, তা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার পর তার প্রথম সৃষ্টি আদমকে (আ:) দিলেন তাঁর জীবন-ব্যবস্থা। আমরা ধোরে নিতে পারি এ ব্যবস্থা ছিলো ছোট, সংক্ষিপ্ত- কারণ তখন অল্প সংখ্যক নর-নারীর জন্যই ব্যবস্থা দিতে হোয়েছিলো। আদম (আ:) এবং তাঁর পুত্র কন্যা ও নাতি-নাতনিদের জন্য এবং সমস্যাও নিশ্চয়ই ছিলো সীমিত। কিন্তু তারপর আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বংশ বৃদ্ধি চোললো। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আদমের (আ:) সন্তানরা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, ফলে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়লো। স্রষ্টা কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ভুলেন নি। বনি-আদমের বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে তিনি তাঁর প্রেরিত পাঠিয়ে তাদের জন্য জীবনব্যবস্থা পাঠাতে থাকলেন- যে ব্যবস্থা অনুসরণ কোরলে তারা নিজেদের মধ্যে অশান্তি, ফাসাদ, রক্তপাত না কোরে শান্তিতে, এসলামে, বাস কোরতে পারে। এদিকে এবলিস অর্থাৎ শয়তানও ভুললো না তার প্রতিশ্রুত কাজ। সেও প্রতিটি বনি-আদমের দেহ-মনের মধ্যে বোসে তাকে নানা রকম বুদ্ধি পরামর্শ দিতে থাকলো, নতুন নতুন উপায় বাতলাতে থাকলো যাতে মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, অন্ততপক্ষে বিকৃত করে; এবং ফলে সেই অন্যায়, ফাসাদ আর রক্তারক্তিতে জড়িত হোয়ে পড়ে। যখনই এবলিস কোন জন সমাজে সফল হোয়েছে তখনই আল্লাহ সেখানে নতুন একজন প্রেরিত পাঠিয়েছেন সেটাকে সংশোধন কোরতে (সুরা আন নহল ৩৬)।

এখন দেখা দরকার যে, বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন সেটা মূলতঃ কী? পর্যবেক্ষণ কোরলে দেখা যায় এর মূল ভিত্তি হোচ্ছে- **স্রষ্টাকে, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, শুধু একমাত্র প্রভু নয়, সর্বময় প্রভু বোলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।** এই ব্যাপারে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন সেটা হলো 'এলাহ'। বর্তমানে এর অনুবাদ করা হয় 'উপাস্য' শব্দ দিয়ে। এই উপাস্য শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ হয় না। কারণ হোচ্ছে এই যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। যার একটা বিকৃতি হলো আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জাতীয় ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলিতে সীমাবদ্ধ কোরে রাখা; এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনা তার অন্যতম। শুধু 'এলাহ' শব্দ আল্লাহ এ অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন তার অর্থ হল- **যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলংঘনীয়।** আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর সময় এই বিশ্বাসের মূলমন্ত্র রাখা হোয়েছে- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই (লা এলাহা এল্লাল্লাহ) - এবং পরে যোগ হোয়েছে তদানীন্তন নবীর নাম। এই কলেমায় মূলমন্ত্রে কখনো এই এলাহ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ স্রষ্টা ব্যবহার করেন নি। কখনো কোন নবীর সময় লা রব্ব এল্লাল্লাহ বা লা মালেক এল্লাল্লাহ বা তার নিরানব্বই নামের যে কোনটা হোতে পারতো। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষাধিক নবীর- কোন নবীর সময়ের কলেমাতেই ঐ এলাহ ছাড়া অন্য কোন নাম ব্যবহার করেন নি। কেন? এই জন্য যে তিনি 'একমাত্র' যার আদেশ নিষেধ ছাড়া আর কারো আদেশ নিষেধ গ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ কেউ যদি কতগুলি আদেশ নির্দেশ মেনে নিলো কিন্তু অন্য কতকগুলি অস্বীকার করলো, তবে তিনি আর তার এলাহ রোইলেন না। এটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কারণ যে রকম জীবনব্যবস্থা অনুসরণ কোরলে মানুষ পৃথিবীতে গোলমাল, অশান্তি, অবিচার, অন্যায়, যুদ্ধ ও রক্তপাত করা থেকে অব্যাহতি পাবে সে রকম জীবন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই যে মূখ্য ও প্রধান হবে এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। তাই আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন তার কালেমা, মূলমন্ত্র স্থির কোরে দিলেন- তাকে একমাত্র বিধানদাতা বোলে স্বীকার করার ভিত্তিতে। জীবন-বিধানের এই ভিত্তিটাকে অর্থাৎ তওহীদকে স্রষ্টা এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সেই আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে তাঁর শেষনবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত প্রত্যেককে পাঠানো হোয়েছে ঐ এক দাবি দিয়ে- আমাকে ছাড়া কাউকে প্রভু বোলে, এলাহ বোলে মানবে না। অন্য কারো দেয়া বিধান, আদেশ-নিষেধ মানবে না। মানলে তাদের আমি কিছুতেই মাফ করবো না। কিন্তু ঐ একটি মাত্র দাবি মেনে নিলে আর কোন গোনাহ, পাপের জন্য শাস্তি দেব না (সুরা আন নিসা ৪৮, ১১০, ১১৬)।

এখন দেখা যাক এই যে জীবনব্যবস্থা স্রষ্টা যুগে যুগে পাঠিয়েছেন এটা কী? লক্ষ্য কোরলে দেখা যায় এর ভিত্তি ঐ তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যা চিরস্থায়ী। অন্যভাগ আদেশ-নিষেধ, যেগুলি মেনে চোললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগতভাবে মানুষ পরিপূর্ণ শান্তিতে, প্রগতিতে বাস কোরতে পারে। এই দ্বিতীয় ভাগটি চিরস্থায়ী, সনাতন নয়, এটি স্থান ও কালের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর নবী পাঠিয়ে যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তাতে স্বভাবতঃই স্থান, কাল, পাত্র ও সমস্যাভেদে বিভিন্ন নির্দেশ থেকেছে। আর দু'টি ভাগ এতে সব সময় থেকেছে- সেটা উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার ভাগ। উদ্দেশ্য সব সময়ই একই থেকেছে-শান্তিতে সুবিচারে বসবাস এবং এ উদ্দেশ্য অর্জন কোরতে যে

সমস্ত প্রক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য। এই প্রধান চারটি ভাগকে একত্র কোরে দেখলে পরিষ্ফুট হোয়ে উঠবে যে, আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ কোরবে। তা যদি না হতো তবে তা মানুষের জন্য জীবন-বিধান হোতে পারতো না, হোলেও অসম্পূর্ণ ও আংশিক হোত। অর্থাৎ আল্লাহকে "একমাত্র জীবন-বিধাতা" স্বীকার ও গ্রহণ করার পর জীবনের কোন অঙ্গনে (Facet) অন্য কোন বিধান অর্থাৎ আইন স্বীকার করার অর্থ হলো তাকে ছাড়াও অন্য বিধাতা স্বীকার কোরে নেওয়া- শেরক।

এই যে যুগে যুগে প্রভু আল্লাহ আমাদের জন্য জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন তা তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর নবীদের মাধ্যমে- যারা আমাদেরই মত মানুষ। এখানে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। যেহেতু ঐ প্রেরিতরা আমাদের মত মানুষ কাজেই যখন তারা ঘোষণা কোরেছেন যে তাঁকে জীবন-বিধান দিয়ে পাঠানো হোয়েছে তখন তাঁর কথা সত্য কি মিথ্যা তা স্বভাবতঃই প্রশ্নের ব্যাপার হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ যদি এ কথা প্রশ্ন কোরে যে, এই লোকটি তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য, নেতৃত্ব লাভের জন্য বা তার মনগড়া কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য স্রষ্টার দোহাই দিচ্ছে না তার প্রমাণ কি? এ প্রশ্ন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। কাজেই আল্লাহ এ ব্যাপারেও তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে রকমের ব্যবস্থা নিয়েছেন তার প্রেরিতদের সম্বন্ধেও সেই রকম ব্যবস্থা নিলেন। অর্থাৎ চিহ্ন। তিনি তাঁর প্রেরিতদের মধ্যে, তাদের কাজের মধ্যে এমন সব চিহ্ন দিয়ে দিলেন যা যে কোন যুক্তিসম্পন্ন মানুষের সন্দেহ নিরসন করার জন্য যথেষ্ট। সংগত কারণে তিনি তাঁর প্রতিটি নবীকেই অলৌকিক শক্তি দিলেন যা সাধারণ মানুষের থাকে না। এগুলোর নাম তিনি দিলেন চিহ্ন- আয়াত। আমরা এখন বলি মো'জেজা, অলৌকিক ঘটনা বা বিভূতি। যাদের জন্য এই নবীরা জীবন-ব্যবস্থা, দীন নিয়ে এসেছেন তারা তাঁর কথায় সন্দেহ বা অবিশ্বাস কোরলে তিনি ঐ অলৌকিক কাজ কোরে তাদের সন্দেহ অপনোদন কোরেছেন।

এমনি কোরে যুগে যুগে, যখনই জাতি জনগোষ্ঠী আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা হয় ত্যাগ কোরেছে না হয় তাকে এমন বিকৃত কোরে ফেলেছে যে তা আর তাদের শান্তি, এসলাম দিতে পারে নি, তখনই স্রষ্টা তাঁর করুণায় আরেক নবী পাঠিয়েছেন (হাদিস- ইবনে মাসুদ (রাঃ) থেকে মুসলিম, মেশকাত)। তিনি এসে বোলেছেন- তোমরা আমার পূর্ববর্তী নবীর আনা জীবন-বিধান বিকৃত কোরে ফেলেছো। তাই আমাকে পাঠানো হোয়েছে তোমাদের জন্য নতুন বিধান দিয়ে। শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই নতুন প্রেরিতের কথায়, কাজে তার জীবন-ধারায় ও তার অলৌকিক কাজ করার শক্তি দেখে তাকে বিশ্বাস কোরে এই নতুন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরেছে। আর কিছু লোক শয়তানের প্ররোচনায় তাঁকে অস্বীকার কোরে আগের বিকৃত দীনকে আঁকড়ে ধোরে রেখেছে। পৃথিবীতে আরেকটি দীন, জীবন-ব্যবস্থার জন্ম হোয়েছে। তারপর কালে এবলিসের-প্ররোচনায় এই নতুন দীনেও বিকৃতি এসেছে এবং এতখানি বিকৃতি এসেছে যে ওটাও আর মানুষকে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে পারে নি। তখন আল্লাহ আবার এক নতুন রসুল পাঠিয়েছেন- আগের মত কোরে আবার এক দীন, ধর্ম পৃথিবীতে সংযোজন হোয়েছে। এমনি কোরে মানব জাতির শান্তির জন্য আল্লাহ লক্ষাধিক প্রেরিত পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য- সেই এক। মানুষ যাতে নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি না কোরে, অবিচার না কোরে, যুদ্ধ, রক্তপাত না কোরে পূর্ণ শান্তিতে পৃথিবীতে বসবাস করে। যখনই কোন জনগোষ্ঠী, জাতি কোন প্রেরিতকে বিশ্বাস কোরে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরে তা তাদের জাতীয়, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা কোরেছে তখন তাদের মধ্যকার সমস্ত অশান্তি, অবিচার, মারামারি, রক্তপাত বন্ধ হোয়ে গেছে। তারা অনাবিল সুখ ও শান্তিতে, এসলামে বাস কোরতে লেগেছে। কিন্তু এই শান্তি চিরস্থায়ী হয় নি, কারণ শয়তানও বোসে ছিল না এবং বোসে নেই। সে অবিশ্রান্তভাবে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে ঐ জীবন-ব্যবস্থাকে বিকৃত কোরে, অচল কোরে দিয়ে পরিণতিতে মানুষকে আবার ঐ ফাসাদ আর রক্তপাতে জড়িত কোরতে এবং কোরেছেও।

বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হোল?

অতীতের দিকে ফিরে চাইলে আমরা দেখি যে মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্ব ঠিক রেখে যুগে যুগে যে এসলাম পৃথিবীতে এসেছে তার রূপ কিছু কিছু বিভিন্ন হোয়েছে- এবং যে সব ব্যাপারে বিভিন্ন হোয়েছে তা সবই স্থান, কাল ও পাত্রের অধীন। উদাহরণ রূপে আদমের (আঃ) উপর যে এসলাম দেয়া হোয়েছিলো তাতে বিধান ছিলো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে। স্বভাবতঃই, কারণ তখন তারা ছাড়া পৃথিবীতে আর মানুষ ছিলো না। কিন্তু পরে যখন মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলো, তারা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আর সে প্রয়োজন রোইলো না এবং পরবর্তী যে সব নবীরা এলেন তাদের উপর বিধানগুলিতে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ কোরে দেয়া হলো। অনুরূপভাবে আস্তে আস্তে যেমন মানুষ নতুন ব্যাপারে জ্ঞান লাভ কোরতে লাগলো, নতুন নতুন আবিষ্কার কোরতে লাগলো, এক কথায় মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি উন্নতি কোরতে লাগলো- তেমনি আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাতেও সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিধান দেয়া হোতে লাগলো। প্রতিবার যেখানেই নবীরা এসেছেন এবং যেখানকার মানুষ তাদের আনা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরেছে সেখানে সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। আর যেখানে মানুষ নবীদের প্রত্যাখ্যান কোরেছে সেখানে তারা অশান্তি, অবিচারে রক্তপাতে ডুবে থেকেছে এবং কালে ধ্বংস হোয়ে গেছে।

একজন নবী একটা জনসম্প্রদায়ে বা জাতিতে যখন প্রেরিত হোয়েছেন তখন তাকে সম্মুখীন হোতে হোয়েছে তার পূর্ববর্তী নবীর বিকৃত ব্যবস্থার অনুসারীদের। পূর্ববর্তী দীনকে বিকৃত করা না হোলে হয়তো তখন তাকে পাঠানোর প্রয়োজনই হতো না। এই দীনগুলি কেমন কোরে বিকৃত হোয়েছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণার প্রয়োজন। যখন কোন একজন নবী তাঁর কাজে সফল হোয়েছেন অর্থাৎ তার আনা জীবনব্যবস্থা তাঁর সম্প্রদায় বা জাতি গ্রহণ কোরেছে, প্রতিষ্ঠা কোরেছে, তখন তার ফলে সে জাতিতে শান্তি, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায়ের পর শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ ঐ ব্যবস্থা বিকৃত কোরতে শুরু কোরেছে। এই বিকৃতিগুলোকে শ্রেণি বিন্যাস কোরলে প্রধান প্রধানগুলো হলো-

ক) নবীর ব্যক্তিত্বে, চরিত্রের মাধুর্যে মুগ্ধ, তাঁর অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত তাঁর জাতি, উম্মাহ তাঁকে অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা কোরেছে। তাদের মধ্যে অনেকে তাঁকে প্রাণ ভরে ভালোও বেসেছে। তাঁর ওফাতের পর ক্রমে ক্রমে এই ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা তাঁকে আরও উপরের আসনে বসাতে চেয়েছে। এটা একটা স্বাভাবিক মানবিক মানসিক বৃত্তি- যে যাকে যত ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে সে তাকে তত বড় কোরে দেখতে চায়, দেখাতে চায়। যদিও রসুল তার জীবিতকালে নিঃসন্দেহে বার বার পরিষ্কার কোরে বোলে গেছেন যে আমি তোমাদের মতই মানুষ, শুধু আমাকে পাঠানো হোয়েছে তোমাদের জন্য জীবন-বিধান দিয়ে, কিছু অলৌকিক শক্তি দিয়ে। কাজেই আমি যা, অর্থাৎ রসুল, এর বেশি আমাকে অন্য কিছু মনে কোরোনা, কোরলে মহা অন্যায় হবে। কিন্তু অতি ভক্তি আর শয়তানের প্ররোচনায় যতই দিন গেছে ততই তাদের নবীকে উপরের দিকে ওঠাতে ওঠাতে শেষ পর্যন্ত কোন নবীকে আল্লাহর ছেলে, কোন নবীকে একেবারে আল্লাহর আসনেই বসিয়েছে।

খ) নবীরা চলে যাবার পর তাঁর জাতি, উম্মাহ, তাদের জীবন ব্যবস্থাটাকে নিয়ে অতি বিশ্লেষণ কোরতে শুরু কোরেছে। যে কোন জিনিষেরই অতি বিশ্লেষণ সে জিনিসটিকে নষ্ট, ধ্বংস কোরে দেয়। তাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অতি বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন রকমের মতামত গড়ে উঠেছে, সেই মতামতের অনুসারী জুটেছে, জাতি নানা মতে বিভক্ত হোয়ে গেছে। তারপর অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই বিভক্ত অর্থাৎ মাযহাব ও ফেরকাগুলির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হোয়েছে, ফলে জাতি ধ্বংস হোয়ে গেছে।

গ) এই অতি বিশ্লেষণের অবশ্যম্ভাবী ফল আরও হোয়েছে। তার একটা হলো জীবন-বিধানের আদেশ-নিষেধগুলির গুরুত্বের ওলট-পালট হোয়ে যাওয়া- অর্থাৎ কোন্‌টা অতি প্রয়োজনীয়, কোনটা তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয়, কোনটা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, এগুলির উল্টা-পাল্টা কোরে ফেলা- যদিও সবগুলিই জীবন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় অগ্রাধিকার (Priority) কোনটা আগে কোনটা পরে। অতি বিশ্লেষণের ফলে জীবন-ব্যবস্থাগুলির যে সব অনুশাসন অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, যার উপর সমগ্র ব্যবস্থাটার জীবন-মরণ নির্ভর কোরত সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় স্থলে নামিয়ে দিয়ে অতি অপ্রয়োজনীয় নির্দেশগুলিকে মহা গুরুত্ব দিয়ে তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হোয়েছে।

ঘ) অতি বিশ্লেষণের আরও এক আত্মঘাতী ফল এই হোয়েছে ঐ জীবন-ব্যবস্থাগুলি যা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জন্য এসেছিলো তার ব্যাখ্যা দেওয়ার (Commentary) অধিকার একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ হোয়ে পড়েছে। স্বভাবতঃই। কারণ যে আদেশ নিষেধগুলি জাতির সবার জন্যই অবতীর্ণ হোয়েছে তা সবারই বোধগম্য ছিলো- কিন্তু ওগুলিকে বিশ্লেষণ, অতি-বিশ্লেষণ কোরে জন সাধারণের বোঝার বাইরে নিয়ে যাওয়া হোয়েছে- ফলে ঐ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত শ্রেণিটির মধ্যে তা আবদ্ধ হোয়ে পড়েছে এবং পরবর্তীতে জীবন-বিধানের সব রকম ব্যাপারে তাদের মতামত হোয়ে দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত। **এই হলো পুরোহিত শ্রেণি এবং এমনি কোরেই প্রতি জীবন-বিধান, প্রতি ধর্মে এরা নিজেরা নিজেদের সৃষ্টি কোরেছেন এবং জীবন-বিধানের মূল লক্ষ্যই বিনষ্ট কোরে ফেলেছেন।** জাতির জনসাধারণ অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে পুরোহিতদের কাছে প্রক্রিয়ার ছোটখাটো ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে বিধান (ফতোয়া) জানতে চেয়েছে আর পুরোহিতরা অতি উৎসাহে নতুন নতুন দুর্বোধ্য বিধান তৈরি কোরেছেন আর তা তাদের দিয়েছেন।

ঙ) আরেক রকমের বিকৃতি এসেছে কায়েমী স্বার্থের (Vested Interest) কারণে। প্রথমে নতুন প্রেরিতের ধর্মকে মেনে নিলেও পরে তারা দেখেছে যে তা তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হোয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন তারা ছলে-বলে, বিধান বিশ্লেষণকারীদের (মুফতি) হাত কোরে ঐ স্বার্থ বিরোধী নির্দেশগুলির পরিবর্তন কোরেছে। ক্রমশঃ সমস্ত জীবন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ভুলে যেয়ে ওর খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি পালন করাই একমাত্র কর্তব্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি জীবন ব্যবস্থা ঐসবগুলি কারণের একত্রিত, সম্মিলিত প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। স্রষ্টা দিয়েছেন মানুষকে একটা প্রাণবন্ত, বেগবান (Dynamic) জীবন ধর্ম। শয়তানের প্ররোচনায় সেটাকে একটা উদ্দেশ্য-বিহীন, স্থবির, প্রাণহীন, অনুষ্ঠান সর্বস্ব ব্যাপারে পরিণত কোরেছে। ফলে আবার মানুষ অনিবার্যভাবে সেই অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর রক্তারক্তির মধ্যে পতিত হোয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ আবার তার রসুল পাঠিয়েছেন মানুষকে সত্য, ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনতে।

উপরোক্ত বিকৃতিগুলি ছাড়াও আরও একটি বিশেষ কারণ হোয়েছে নতুন নবী পাঠানোর। সেটা হলো মানুষ জাতির বিবর্তন। এক নবী থেকে তার পরবর্তী নবী পর্যন্ত যে সময় অতীত হোয়েছে, সেই সময়ে মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কিছুটা এগিয়ে গেছে। ধ্বংস

পারিপার্শ্বিকতায় খানিকটা প্রভেদ এসেছে, নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছে। কাজেই পরবর্তী রসুল যে ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বের ব্যবস্থা থেকে কিছু ভিন্নতা থেকেছেই, যদিও মৌলিক সত্য, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব, দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম, সেরাতুল মোস্তাকীম একই থেকেছে। বিভিন্নতাগুলি শুধুমাত্র কম প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোয়, যেগুলি স্থান এবং কালের প্রভাবাধীন।

যখনই কোন নতুন নবী, প্রেরিত এসেছেন তিনি তার জাতিকে যা বোলেছেন তার সারমর্ম, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কিছু এদিক ওদিক ছাড়া এই যে:

ক) আমার পূর্ববর্তী আল্লাহর রসুল তোমাদের যে দীন, জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তোমরা সেটাকে নানাভাবে অর্থহীন, অকেজো কোরে দিয়েছে। তোমরা আল্লাহর বইয়ে হাত ঘুরিয়েছো, তোমাদের ইচ্ছামত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার অর্থ বিকৃত কোরেছো। গুরুত্ব বদলিয়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি কোরেছো। এমন কি একমাত্র প্রভুর সার্বভৌমত্ব নষ্ট কোরে বহুত্ববাদে নিমজ্জিত হোয়েছো। পরম করুণাময় তাই আমায় পাঠিয়েছেন তোমাদের এই বোলতে যে-

খ) তোমরা যাকে অনুসরণ কর বোলে দাবি কর, তিনিও তার মাধ্যমে প্রেরিত বইকে আমি স্বীকার কোরেছি (সুরা আলে ইমরান ৩, সুরা আল আনাম ৯২, ৯৩)।

গ) কিন্তু তোমরা ওটা এত বিকৃত কোরে ফেলেছো যে তা এখন বাতিল ঘোষণা কোরছি।

ঘ) এখন থেকে আমি যে বই এবং জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছি সেইটা কার্যকরী হবে।

ঙ) আমি যে সত্যই স্রষ্টার প্রেরিত তা তোমাদের কাছে প্রমাণ করার জন্য আমাকে কতকগুলি চিহ্ন, আয়াত, মো'জেজা দেয়া হোয়েছে, সেগুলো তোমরা দেখে নাও এবং

চ) আমাকে প্রেরিত, রসুল বোলে স্বীকার কোরে নাও এবং পূর্বের বিকৃত ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আমার মাধ্যমে প্রেরিত স্রষ্টার দেয়া এই নতুন জীবন-বিধান গ্রহণ কর।

তার এর ঘোষণার ফল কি হোয়েছে? বিভিন্ন প্রেরিতের জীবনীতে আমার বিভিন্ন ফল দেখি। কোন রসুলের ডাকে কিছু লোক তাঁকে বিশ্বাস কোরে তার ধর্ম গ্রহণ কোরেছে, আর কিছু লোক তাঁকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার কোরে আগের সেই অচল ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধোরে রেখেছে। কোন নবীর ডাকে অল্প কয়েকজন সাড়া দিয়েছে, বাকিরা আগের বাতিল অনুষ্ঠানগুলিকেই চালু রেখেছে। কোন কোন নবীকে পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীরা হত্যা পর্যন্ত কোরে ফেলেছে (আলে ইমরান ১৮১, ১৮৩)। আবার এমনও হোয়েছে যে কোন নবীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হোয়েছে এবং হত্যা করা হোয়েছে, কিন্তু তাঁর ওফাতের পর বহু মানুষ তাঁকে স্বীকার ও বিশ্বাস কোরে তাঁর আনা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত কোরেছে।

প্রতি নবীর সময় অধিকাংশ মানুষ তাদের হৃদয়ের ভেতরে বুঝতে পেরেছে যে এই লোক সত্যই স্রষ্টার প্রেরিত-রসুল। কারণ তার ব্যক্তিত্বে, চারিত্রিক শক্তিতে প্রবল অসাধারণত্ব তো ছিলোই, তার উপর চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে ছিলো অলৌকিক কাজ কোরে দেখাবার ক্ষমতা, আয়াত, মো'জেজা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদল লোক তাঁকে স্বীকার কোরে নতুন এসলামকে গ্রহণ কোরেছে, আরেক দল করে নি।

বিচার কোরলে আমরা দেখতে পাই- যারা স্বীকার কোরেছে তাদের কারণ:

ক) পূর্ববর্তী বিকৃত এসলামে থেকেও যারা তাদের আত্মাকে এবলিসের প্রভাব থেকে ব্যক্তিগতভাবে কমবেশি মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন এবং যার ফলে দীনের অবনতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য কোরছিলেন, কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিলো না।

খ) সাধারণ লোক, যারা বিকৃত ব্যবস্থায় নির্যাতিত হোয়েও অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিলো,

গ) রসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে নতুন এসলাম গ্রহণ কোরলে যে নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী তাকে যারা ভয় করে নি।

আর যারা অস্বীকার কোরেছে তাদের কারণ: ক) পূর্ববর্তী এসলামের পুরোহিত শ্রেণি, যারা সেই দীনের ধারক, বাহক বোলে নিজেদের মনে কোরতেন। এই শ্রেণির মনে চিরদিন তাদের জ্ঞানের অহংকার বিদ্যমান ছিলো। স্বভাবতঃই- কারণ তারা সমাজের, জাতির দেয়া চাঁদা, দান ইত্যাদির উপরই বেঁচে থাকতেন এবং নিরলসভাবে ধর্মের বিধান, নিয়ম, ইত্যাদির বিশ্লেষণ, অতি-বিশ্লেষণ কোরতেন এবং জনসাধারণকে বিধান (ফতোয়া) দিতেন। কঠোর পরিশ্রম কোরে নতুন বিধান সৃষ্টি কোরতেন যাতে অন্যান্য পুরোহিতদের চেয়ে তার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়। এই পুরোহিত শ্রেণির মধ্যে বিধান-ব্যবস্থা ইত্যাদি (ফতোয়া) নিয়ে তিক্ত মতভেদ থাকলেও নতুন নবীর ব্যাপারে তারা ছিলেন একত্র। কারণ নতুন এসলামকে মেনে নিলে ঐ মহা সম্মানিত স্থান থেকে তাদের পতন হবে এ কথা সবার চেতন, অবচেতন উভয় মনই জানতো। যে জ্ঞানের অহংকারের জন্য তাদের মধ্যে অবিশ্রান্ত তর্কাতর্কি, বহাস লেগে থাকতো, সেই অহঙ্কারই তাদের শ্রেণিকে নতুন নবীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ কোরতো। প্রত্যেক নবী সব চেয়ে প্রচণ্ড বাধা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হোয়েছেন এই শ্রেণিটির কাছ থেকে। খ) যারা পুরোহিত শ্রেণিভুক্ত না হোয়েও অতি নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন কোরতেন, ঐ পুরোহিত শ্রেণির সৃষ্ট বিভিন্ন দল বা ফেরকার কোনটি চুলচেরাভাবে পালন কোরতেন।

গ) আর অস্বীকার কোরেছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা ঐ পুরোহিত শ্রেণির আদেশ-নিষেধ মানতে এমন অভ্যস্ত হোয়ে গিয়েছিলো যে ঐ পুরোহিতদের ছাড়া অন্য কারো কথা শোনার সময় ও ইচ্ছা তাদের ছিলো না। এদের মধ্যে অনেকে যদিও বুঝতে পেরেছে যে- এই মানুষটি সত্য নবী, কিন্তু তবুও তাকে স্বীকার ও

গ্রহণ কোরলে সমাজে যারা পুরোনো ব্যবস্থা আঁকড়ে আছে তাদের বিদ্রূপ, নির্যাতন, এমন কি নিজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির ভয়ে তারা প্রকাশ্যে নবীকে অস্বীকার কোরেছে।

ঘ) আরো এক ধরনের মানুষ রসুলদের স্বীকার ও গ্রহণ করে নি। এরা হলো তারা যারা প্রথম দিকে বিরোধিতা কোরেছে সত্যাই তাকে মিথ্যা মনে কোরে। কিন্তু পরে যখন তার চরিত্র, চিহ্ন-নিদর্শন, অলৌকিক কাজ দেখে বুঝতে পেরেছে যে, আমি তো ভুল কোরেছি- তখন কিন্তু তার প্রবৃত্তি, নফস, রিপু যাই বলুন, তাকে বাধা দিয়েছেন। বোলেছে- তুমি যাকে এতদিন ভণ্ড, মিথ্যাবাদী বোলে লোকজনকে তাকে স্বীকার করা থেকে বাধা দিয়েছো! আজ তার কাছে নত হোলে লোকে হাসবে না? এই যে আপাত দৃষ্টিতে নিজেকে ছোট করা (Loss of face), এ কোরতে না পেরে বহু লোক সত্য জেনেও রসুলের বিরোধিতা কোরেছে- রসুলকে ও তাঁর আনা নতুন এসলামকে স্বীকার করে নি।

যদিও সত্য নবীকে স্বীকার ও গ্রহণ না করার কয়েকটি বিভিন্ন কারণ উপস্থাপন কোরলাম। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যায় আসলে সবগুলির মূল কারণ অহংকার- (Pride, Vanity)। **এই কারণেই প্রতি ধর্মে বারবার বলা হোয়েছে যে যার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার, আমিত্ব থাকবে সে মুক্তি পাবে না। মানুষের মধ্যে যে ষড়রিপুর কথা বলা হয়, তার একটা অহংকার। আশ্চর্য কি- এই ষড়রিপু, অর্থাৎ ছয়টা প্রবৃত্তির মধ্যে পাঁচটা আল্লাহর মধ্যে নেই, শুধু মানুষের মধ্যে আছে। আর ষষ্ঠটা অর্থাৎ অহঙ্কার স্বয়ং আল্লাহর মধ্যে আছে এবং এটা শুধু তারই সাজে, মানুষের নয়।** তাই অহংকারের শাস্তি অতি দ্রুত এবং এ জীবনেই। আমার মনে হয় দিনের আলোর মত প্রোজ্জ্বল সত্যকেও অস্বীকার করাবার জন্য অহংকারের মত শক্তিশালী শয়তানী শক্তি আর নেই।

যুগ যুগ ধোরে একটার পর একটা দীন নিয়ে নবীরা কেন অবতীর্ণ হোয়েছেন তা আমরা আলোচনা কোরলাম। কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন মনে হোলেও আসলে সবগুলিই সেই এসলাম, দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ, সরল, অতি সহজে বোধগম্য, চিরন্তন জীবন-ব্যবস্থা, যা গ্রহণ এবং সমষ্টি ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরলে অবশ্যম্ভাবী ফল মানুষের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা, যা আল্লাহ আমাদের জন্য চান।

ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রের বিধানই মানুষকে শান্তি দিয়েছে

বর্তমানে এসলাম সম্বন্ধে দু'টি ভুল ধারণা প্রচলিত। একটি হলো মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটি যে ধর্মে বিশ্বাস করে এটিকে বলা হয় এসলাম এবং অন্যান্য ধর্মকে অন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হোয়েছে। কিন্তু আসলে আল্লাহ আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষ নবী (দ:) পর্যন্ত যতবার যতভাবে জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন সবগুলোই ঐ একই নাম এসলাম, শান্তি অর্থাৎ যে জীবন-বিধান অনুসরণ কোরে চোললে মানুষ শান্তিতে সুখে বাস কোরতে পারবে আর অস্বীকার কোরলে তার অবধারিত পরিণতি অশান্তি, রক্তারক্তি, অবিচার। রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক অবিচার- যা মালায়েকরা বোলেছিলেন।

দ্বিতীয়টি হলো এই ধারণা (আকীদা) যে, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম এসলাম। এটাও ভুল। কারণ আল্লাহ ইচ্ছা কোরলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাঁকে বিশ্বাস কোরবে। কোন অবিশ্বাসী, কোন সন্দেহকারী, কোন মোশরেক বা মোনাফেক থাকবে না (সুরা আল আনা'ম ৩৫, সুরা ইউনুস ১০০)। কাজেই তা নয়। আল্লাহ মানুষের মধ্যে তার নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন অর্থ মানুষের মধ্যে যুক্তির শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সর্বোপরি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, দিয়ে নবী পাঠিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে পথে চোললে সে নিজেদের মধ্যে মারামারি, রক্তারক্তি না কোরে শান্তিতে থাকে। এরপর তিনি দেখবেন কে বা কারা তাঁর দেখানো পথে চোলবে আর কে বা কারা তা চোলবে না।

কাজেই আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম এসলাম নয়। তাঁর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করার ফল হিসাবে যে শান্তি সেই শান্তির নাম এসলাম। মানুষ যদি যেসব নিয়ম, আইনের মধ্যে এই জগত সৃষ্টি করা হোয়েছে ও চোলছে তা সব জানতো তবে হয়তো মানুষই নিজেদের জন্য এমন জীবন-ব্যবস্থা, ধর্ম তৈরি কোরে নিতে পারতো যা মেনে চোললেও ঐ শান্তি এসলাম আসতে পারতো। কিন্তু মানুষ তা জানে না- তাকে আল্লাহ অতখানি জ্ঞান দেন নি। তাই স্রষ্টা তাকে বোলে দিয়েছেন কোন পথে চোললে, কেমন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরলে ঐ অভীষ্ট শান্তি, এসলাম আসবে। বোলে দিয়েছেন তাঁর নবীদের মাধ্যমে। মনুর (আ:), কৃষ্ণের (আ:), যুধিষ্ঠিরের (আ:), এব্রাহীমের (আ:), মুসার (আ:), ঈসার (আ:) এবং আরও অনেক অনেক নবীদের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে মোহাম্মদের (দ:) মাধ্যমে। [মনু (নুহ আঃ) কৃষ্ণ (আ:), যুধিষ্ঠির (ইদরীস আঃ) এরা যে নবী ছিলেন তা আমার গবেষণার ফল, ব্যক্তিগত অভিমত। এ অভিমত আমি অন্য কাউকে গ্রহণ কোরতে জোর কোরছি না]। কোন প্রাণী হত্যা কোরব না, কেউ আমার কোট চুরি কোরলে তাকে জোব্বাটাও দিয়ে দিবো, এ অর্থে এ এসলাম নয়। যে ধর্ম ঐ শিক্ষা প্রচার করে তারা সংখ্যায় পৃথিবীতে অন্য সব ধর্মের চেয়ে বেশি কিন্তু সমস্ত পৃথিবী আজ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি অশান্তি আর রক্তারক্তিতে লিপ্ত। শুধু তাই নয় ঐ মতে বিশ্বাসীরা এই শতাব্দীতেই দু'বার নিজেদের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে প্রায় পনের কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে, হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টি কয়েক লক্ষ মানুষসহ ধ্বংস কোরেছে এবং আজ পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে সম্পূর্ণ মানব জাতিটাকেই

করার মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

মানুষকে নিজেদের মধ্যে অশান্তি, অবিচার, মারামারি না কোরে শান্তিতে, এসলামে থাকার জন্য জীবন বিধান দিয়ে আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি স্থানে, প্রতি জনপদে, প্রতি জাতিতে তার প্রেরিতদের, নবীদের পাঠিয়েছেন (সুরা আন নহল ৩৬)। মানুষ জাতির কিছু অংশ তা গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা কোরেছে, কিছু অংশ করে নি। যারা গ্রহণ কোরেছে তাদের সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি জীবনের সমস্ত কিছুই ঐ ব্যবস্থার নির্দেশে পরিচালিত হোয়েছে। তাদের সমাজের আইনের উৎস শুধু ঐ জীবন-বিধান বা ধর্মই ছিলো না ঐ বিধানই আইন ছিলো, ওর বাহিরের কোন আইন সমাজ গ্রহণ কোরত না। অনেক কারণে (বিকৃতির কারণগুলো পেছনে বোলে এসেছি) আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান বদলিয়ে ফেলে বা ইচ্ছামত তার ভুল ব্যাখ্যা কোরে তা চালানো হোয়েছে। কিন্তু ঐ ভুল ও অন্যায় আইনকেও সেই ধর্ম বা দীনের আইন বোলেই চালানো হোয়েছে। তার বাহিরের, মানুষের তৈরি বোলে চালানো যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসকে না তলিয়ে, শুধু এক নজরে যারা পড়েছেন তারাও এ কথা অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে মানব সমাজ চিরদিন শাসিত হোয়ে এসেছে ধর্মের আইন দিয়ে। যখন যেখানে যে নবী ধর্ম বা জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা কোরেছেন, সেখানে রাজা বা শাসনকর্তা শাসন কোরেছেন সেই আইন দিয়ে- অন্য কোন কিছু দিয়ে নয়। আইনের নির্দেশ, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কোরেছেন সমাজের বিজ্ঞেরা, পুরোহিতরা, আর তাকে প্রয়োগ কোরেছেন রাজারা, শাসকরা। ওর বাইরের কোন আইন, আদেশ চালাবার চেষ্টা কোরলে সমাজ তা গ্রহণ কোরত না, প্রয়োজনে বিদ্রোহ কোরত। উদাহরণ হিসাবে পশ্চিম এশিয়া নিন। ইহুদিদের আগে ওখানে আমন বা রা দেবতা থেকে শুরু কোরে অনেক রকম দেব-দেবীর ধর্মের আইন চোলতো। ওগুলোও পূর্বতন কোন নবীর আনা দীনের বিকৃতির ফল ছিলো। এব্রাহীম (আ:) আবার আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার পর ইহুদিরা যতদিন মধ্য এশিয়ায় ছিলো ততদিন ঐ আল্লাহ প্রেরিত দীনই ছিল তাদের জাতির আইন। ভারতের কথা ধরুন। রামায়ন, মহাভারতসহ ইতিহাস পড়ুন। দেখবেন রাজারা শাসন কোরেছেন শাস্ত্রানুযায়ী- অর্থাৎ ওটাই ছিলো শাসনতন্ত্র (Constitution)। ঐশ্বরিক বইয়ের (Scripture) **উপর ভিত্তি কোরে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রের বিধান দিতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এবং বিধান বা আইন জনগণের উপর প্রয়োগ ও তার রক্ষার দায়িত্ব ছিলো ক্ষত্রিয় রাজাদের উপর। এই শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে কোন আদেশ, নির্দেশ দেয়া রাজা বা শাসকের সাধ্য ছিলো না। ইউরোপের অবস্থাও তাই ছিলো। পোপের নির্দেশে রাজ্য শাসন কোরতেন রাজারা। কোন রাজা পোপের নির্দেশ অমান্য কোরতে পারতেন না- কোরলে তার দুরবস্থার সীমা থাকতো না।** মোট কথা পৃথিবীর কোথাও আইনের উৎস ধর্ম ছাড়া আর কোন কিছুকে গ্রহণ করা হয় নি।

এ পর্যন্ত যা বোলে এলাম, তা সমস্তটা একত্র কোরলে আমরা একটা পরিষ্কার ছবি পাই। সেটা হলো- গোটা পৃথিবীটাকে পটভূমি হিসাবে নিয়ে মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে যদি আরম্ভ করি তবে দেখতে পাই যে প্রথম মানব আদম (আ:) আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান, দীন এসলাম অনুযায়ী চোলতে লাগলেন তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে এবং ফলে শান্তিতে বাস কোরতে থাকলেন। এবলিস তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী চেষ্টা চালাতে লাগলো সেই জীবন ব্যবস্থা থেকে মানুষকে বিচ্যুত কোরতে। মানুষেরই ভেতরে বোসে তাকে প্ররোচনা দিয়ে আইন ভঙ্গ করাতে। কবিলকে দিয়ে তার ভাই হবিলকে হত্যা করালো। তারপর আরো আইন ভাঙ্গার ফলে যখন ওটা যথেষ্ট বিকৃত হোয়ে গেলো তখন আল্লাহ পাঠালেন দ্বিতীয় রসুল। তার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো অনেকে রোয়ে গেলো সেই পুরোনো ব্যবস্থায়- যেটা ছিলো আদমের (আ:) উপর দেয়া। সৃষ্টি হলো দু'টো দীন, দু'টো ধর্ম, দু'টো জীবনব্যবস্থা। এদিকে মানুষের বংশ বৃদ্ধি চোলছেই। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লো আদম সন্তানরা পৃথিবীর চারিদিকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেখানেই তারা বসতি স্থাপন করলো সেখানেই আসতে লাগলেন প্রেরিত নবীরা আল্লাহর দেয়া দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম নিয়ে। উদ্দেশ্য সেই একই- মানুষ যেন নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি না কোরে, রক্তপাত না কোরে শান্তি ও সুখে বাস কোরতে পারে। একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নবী উপস্থিত ছিলেন। কেউ হয়তো চীনের এক প্রান্তে, কেউ দক্ষিণ আমেরিকায়, কেউ ইউরোপে, কেউ মধ্য এশিয়ায়, কেউ ভারতের কোন কোণে। আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যান নি। যুগ বয়ে চলেছে, নবীরা মানুষের জন্য জীবন-ধর্ম দিয়ে চলে যাচ্ছেন, শয়তান মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে সেগুলো বিকৃত, অকেজো কোরে ফেলছে। তারা আবার আসছেন আবার নতুন কোরে জীবন পথ দিচ্ছেন, নতুন ধর্ম সৃষ্টি হোয়ে চলেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই অতীতে হারিয়ে গেছেন। তারাও হারিয়ে গেছেন, তাদের মাধ্যমে প্রেরিত জীবনব্যবস্থা গুলিও হারিয়ে গেছে। আমরা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই তাদের আনা এসলামকেও দেখতে পাই। পাই, কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে এবং মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃতভাবে।

এই হলো মানুষের প্রকৃত অতীত। ইতিহাসকে বহুলোক বহুভাবে ব্যাখ্যা কোরেছেন। কিন্তু সত্য গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, ন্যায় ও অন্যায়ের অবিরাম দ্বন্দ্ব, সমষ্টি ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আত্মাকে একদিকে এবলিস অন্যদিকে আল্লাহর আত্মা, রুহাল্লাহর টানাটানি- এই হলো আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে আজ পর্যন্ত মানুষের সত্যিকার অতীত। **এবং এ শুধু অতীত নয় ভবিষ্যতও নিঃসন্দেহে এই-ই। এর কোন বিরতি, কোন চ্যুতি হয় নি, হোচ্ছে না, হবে না।**

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

ॐ

হিন্দু নয়, সনাতন

মোফাজ্জল হোসাইন সর্দার

পৃথিবীতে বর্তমানে ১১০ কোটির অধিক জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে হিন্দু বোলে পরিচয় দিয়ে থাকেন যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৫%। আশ্চর্যজনক হোলেও সত্য যে হিন্দু বোলে কোন ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বোলে কোন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতায়, পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই। তাই 'হিন্দুজাতি', হিন্দুধর্ম' এ শব্দগুলো নিয়ে একটু চিন্তার অবকাশ রোয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'হিন্দু' প্রথমে কোনো জাতি ও ধর্মের নাম ছিলো না। হিন্দু শব্দটি উৎসারিত হোয়েছে সংস্কৃত সিন্ধু শব্দটি থেকে। সিন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক নদীর নাম। ঋগ্বেদে সিন্ধু নদের স্তুতি করা হোয়েছে। বার্হস্পত্য সংহিতা বলেঃ

হিমালয়ম সমারভ্য, যবদিন্দুসারোভজং
তাং দেবনির্মিতং দেশং, হিন্দুস্তানং প্রচক্ষতে ॥

অর্থাৎ: দেবতা-নির্মিত যে দেশ হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর (ইন্দু সরোবর) পর্যন্ত প্রসারিত, তারই নাম হিন্দুস্তান। এই শ্লোকে হিন্দুস্তান শব্দটির উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল পারসিয়ানদের মধ্যেই, এতদঞ্চলীয়রা এ এলাকাকে ভারত বোলেই চিনতো। পরবর্তীকালের আরবি সাহিত্যেও আল-হিন্দ শব্দটির মাধ্যমে সিন্ধু নদ অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হোয়েছে। অধিকাংশ গবেষক মনে করেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের নামের সমার্থক শব্দ হিসেবে ফারসিতে হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দটির উৎপত্তি হয়। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ "সিন্ধু নদের দেশ" বা "হিন্দুদের দেশ" বোঝাত। পারস্যের ইরানের লোকেরা সর্বশক্তিমান উপাস্যকে বলতো অহুর। ভারতীয় জিহ্বায় অহুরের 'হ' 'স' হোয়ে অসুর হোয়ে যায়, যদিও অসুর বোলতে অপদেবতা বোঝায়- যা একেবারে বিপরীত অর্থ হোয়ে যায়। তেমনি পারসিকরা ভারতের সিন্ধু নদের 'স' বা 'সিন'-কে পরিবর্তন করে 'হ' কোরে দেয়। এভাবে তাঁরা সিন্ধু নদের তীরবর্তী অধিবাসীদের হিন্দু বলতে শুরু করে।

ভারত বিভাগের পর হিন্দুস্তান বলতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকেই বোঝায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর ফার্সি হিন্দুস্তান শব্দটি হিন্দি ভাষায় গৃহিত হোয়ে যায়। ১৮৫৭ সালে মহা অভ্যুত্থানের পরে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান নেতারাই 'ভারতীয়' অর্থে 'হিন্দুস্তানী' শব্দ ব্যবহার করা শুরু কোরেছেন। "এসব দৃষ্টান্ত অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করে যে হিন্দুস্তান শব্দটির কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য নেই, যা আছে তা বিশুদ্ধ ভৌগোলিক তাৎপর্য।" (শ্রীদাসগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২)। 'সিন্ধুর উচ্চারণ যেমন পারসিদের জিহ্বায় হিন্দু হয় তেমনই গ্রীকদের জিহ্বাতে ইন্দু এবং ইন্দু থেকেই ইন্ডিয়া শব্দটির উৎপত্তি।' ইংরেজি ভাষাতে ভারতের স্থানীয় ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি বোঝাতে হিন্দুইজম বা হিন্দুধর্ম কথাটি চালু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। হিন্দুর হিন্দুত্ব ও এ শব্দের গৌরবের সাথে পারস্য বা ইরান এবং আরবদের অবদান মিশে আছে। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন।

As is well known, Hindu, a modified form of Sindhu, was originally a geographical term used by the western foreigners to denote, first the region round the Sindhu River, and then the whole of India. The Indians, however, never called themselves by this name before the Muslim conquest. *(The History and Culture of the Indian People: R.C. Majumdar)*

সুতরাং মোসলেম জাতির ভারত অধিকারের আগে বৈদিক ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে কোনদিনই হিন্দু বোলে অভিহিত করে নি। উপমহাদেশে প্রচলিত এই ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম, কোর'আনে যেটাকে বলা হোয়েছে দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম, অর্থাৎ তওহীদ (সুরা রূম ৪৩, সুরা বাইয়্যেনা ৫)। আর সনাতন ধর্মই হোল এসলাম যা আদম (Adam) (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষ নবী, আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত সকল নবীর উপর অবতীর্ণ হোয়েছে। কালের ধুলোয় আবৃত সেই আদী, সনাতন ধর্মকে তার প্রকৃত আলোয় পাঠকের সামনে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।

বিশ্বকবির ঐক্যভাবনা

রিয়াদুল হাসান

"মূল ধর্ম এক বটে, বিভিন্ন আধার"

কবিগুরু তার প্রথম জীবনে দেশে ইংরেজরা যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই পরিবেশ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হোয়েছিলেন। প্রতিটি মানুষই পরিবেশ দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়, এটা সরল সত্য। কিন্তু যারা অসাধারণ তারা আত্মবলে বলীয়ান হোয়ে একটা সময়ে পরিবেশকেও প্রভাবিত কোরতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই কথাটি প্রযোজ্য। তিনিও সত্বর পরিবেশ থেকে পাওয়া সাম্প্রদায়িকতার কুপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীকে দাস বানিয়ে রাখার জন্য ইংরেজদের সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ষড়যন্ত্রের রূপ উপলব্ধি কোরতে সক্ষম হন। তিনি সকল ধর্মের মূল সত্যটি উপলব্ধি করে ঘোষণা করেন:

"স্থির হও ভাই। মূল ধর্ম এক বটে,
বিভিন্ন আধার। জল এক, ভিন্ন তটে
ভিন্ন জলাশয়।"(মালিনী)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ধ্বংসের একটি বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হোয়েছে এ কথা ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করবেন। আনন্দমঠে ব্যবহৃত 'বন্দেমাতারম' গানটির সুর করে দেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নিজে গেয়ে বঙ্কিমকে শোনান (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬)। একসময় এই গানটি এতটাই জনপ্রিয় হোয়ে উঠলো যে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীরা একে ভারতের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসাবে প্রতিষ্ঠা কোরতে চাইল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করে না দেখে সবাইকে একজাতিতে পরিণত কোরতে আগ্রহী ছিলেন। যে সময়ের কথা বোলছি তখন ভারতবর্ষে ইংরেজদের আনুকূল্য পেয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজ বেশ প্রভাবশালী অবস্থানে আছে আর মোসলেমদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখা হোয়েছে। সমাজের মধ্যে এই অনৈক্যের বিষবাষ্প কোন মহৎ মানুষকেই ব্যথিত না করে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন, বঙ্কিমের এই গান একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত, তাই এটিকে মিলিত হিন্দু-মুসলমান সকলে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না, তখন কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বয়ং আপত্তি করেছিলেন যাতে ওটা 'জাতীয় সঙ্গীত' না হয়। "... 'বন্দেমাতরম' গানটি কংগ্রেসের 'জাতীয়' রূপে সর্বজাতির গ্রহণীয় নয় বোলে মত প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ উগ্রপন্থীদের বিরাগভাজন হোয়েছিলেন। এবং তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও 'বন্দেমাতরম' প্রথম স্তবক কংগ্রেসে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়। (১৯৩৭)।" [অধ্যাপক (ঢাকা বিশ্ব:) ডক্টর মনিরুজ্জামান: আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃষ্ঠা ২৬৯-প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনকথা, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১]

মুসলমানদেরকে হিন্দু সম্প্রদায় যেভাবে ঘৃণার চোখে দেখতো তা কবিকে খুব ব্যথিত করেছিল এবং এজন্য তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কেই প্রধানত দায়ী করেন। তিনি নিজের কিশোর বয়সের স্মৃতিচারণ কোরতে গিয়ে 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে বলেন, '...আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক-- আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে-তক্তপোষের গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।'

তিনি মুসলমান জাতির বৈশিষ্ট্য ও ভারতবর্ষে তাদের অধিকার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে সঙ্গে ইংরেজের প্রকৃত চরিত্রও অনুধাবন কোরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন: **"হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিস্তার নাই।"**

রবীন্দ্রনাথ আরও বোলেছেন: "তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন

করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোন বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-জাতি-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে পানি খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই, তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অপমান করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।' ('রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৬২৮- ২৯ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্রনাথ আরও বুঝতে পারলেন এবং স্বীকার করে তার নিজের ভাষায় বললেন-"যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয়, এবং হইলে কখনই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয়ই ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম পৃষ্ঠা ৫০২)

১৯২০-২১ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা মহম্মদ আলী ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে মিলন স্থায়ী হবে না। কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্রে মুসলমানদেরকে উন্নতির ধাপ হোতে চরম অবনতিতে নামান হোয়েছে।

তাই কবি 'সমস্যা' নামে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন-হিন্দু-মুসলমানের 'মিলন' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' প্রয়োজন আগে (তথ্য: রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৫৮, ৩৬২)।

কবি মুসলমানদের শক্তি এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা অনুভব করে লিখেছেন: "বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি-সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে..."। ('রবীন্দ্র রচনাবলী'র দশম খণ্ডের ৫২৩ পৃষ্ঠা)।

বিশ্বকবি তার প্রতিভায় ও গুণে ইংরেজকে নয় কেবল মানবজাতিকে মুগ্ধ কোরতে পেরেছিলেন তা প্রমাণিত হোয়েছে। তবে তিনি এও উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজের বিচার মানে অবিচার; আর হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নেতৃত্ব ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না। মি: ডায়ারের নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের গুলিতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হোয়েছিল তাতে কবি ব্যথিত হোয়েছিলেন। আর তারই প্রমাণ দিতে ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক নিজের লেখা যে প্রবন্ধটি কলকাতার টাউন হলে পড়েছিলেন তার একটু অংশ উদ্ধৃতি করলাম-"দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন

পারস্যভ্রমণে গিয়ে মুসলিম বেদুয়িনদের তাঁবুতে রবীন্দ্রনাথ। তার এই ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম, সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন-দলপতি যখন বললেন "আমাদের আদিগুরু বোলেছেন যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই সেই যথার্থ মুসলমান', তখন সে কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলছে এ পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। আমি এঁকে বললেম, একদিন কবিতায় লিখেছি 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'-- আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন-হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেছে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েছি অন্তরের মধ্যে।'

হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভায় অধিনায়ক করিব-তাঁদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব-তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।" (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৬১২)

ভারতে অনেক জাতি ও উপজাতি আছে। এখন যদি রবীন্দ্রনাথের সত্য-ভক্তদের প্রশ্ন করা যায়-বিশ্ববিখ্যাত রবিবাবু কি ভারতের নানাজাতি, নানামত, নানা পরিধানের কথা জানতেন না? তবুও কেন তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' নিয়ে এত লেখালেখি করলেন? আর কোন জাতিকে কেন লিখলেন না? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, তিনি অন্য সব জাতির কথাও লিখেছেন এবং তাদের প্রাপ্য গুরুত্ব তাদেরকে দিয়েছেন।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড়, চীন--
শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

সুতরাং তিনি সবার অংশগ্রহণে গঠিত যে মহান 'সভ্যতা'র উল্লেখ করেছেন তার দেহ ও আত্মায় হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি জাতি সত্ত্বার গুরুত্ব ও ভূমিকাই মুখ্য। এজন্যই তিনি মুসলমান জাতির মর্যাদা, অধিকার ও প্রকৃত মূল্যায়নকে তাঁর লেখনী প্রতিভায় ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এই দু'টি জাতিসত্ত্বার মিলনকে এত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে হিন্দু সমাজকে তা বোঝাতে চেয়েছেন। এখানেও প্রমাণস্বরূপ তাঁর ভাষাতেই বলা যায়- "এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোন মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব হইবে না ... আমরা (হিন্দু) গোড়া হইতে ইংরেজদের স্কুলে বেশি মনোযোগের সাথে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নেই। এইটুকু (পার্থক্য) কোন মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না। "

রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন: "আমরা যে মুসলমাদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই। অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ..... আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোক জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বভাব অত্যন্ত জাগরুক- আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের গুরুত্ব এত বেশি অনুভব কোরেছিলেন যে তা তিনি তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "স্বদেশীযুগে আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহার অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না.....। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সাথে সাথে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সাথে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই"।

ডাঃ কালিদাস নাগ বিলেত থেকে পত্র-মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন-'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী? সেটা ছিল ১৯২২ সাল। পত্রোত্তরে কবি লিখেছিলেন: "খিলাফত উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হোচ্ছে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজেদের বেড়া তুলে রেখেছে। ......অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি ব'লে গণ্য করার মত মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছুই নেই।" চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসবো।"(শ্রী সত্যেন সেন: পনেরই আগস্ট, পৃষ্ঠা ১১০-১১৪)

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি দেখাশোনা কোরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হোয়েছে। তিনি সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন হিন্দু মুসলমান প্রবন্ধে, 'আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বোলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বোলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ-পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন। এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা কোরতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে।'

আজকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে সঙ্কট তা হোচ্ছে মনুষ্যত্বের সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার পেতে হলে যে পদ্ধতি কবিগুরু বাতলে গেছেন তা হোচ্ছে:

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবারে-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

সে মার রহিল জমা

(কবি নজরুলের মানুষ কবিতার মর্মবাণী)

উম্মুতিজান মাখদুমা পন্নী

পরম করুণাময় স্রষ্টা অতি যত্নের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে এই বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়ে প্রেরণ কোরেছেন যেন তারা সুখে শান্তিতে এখানে জীবনযাপন করে। এই পৃথিবী মানুষের জন্য। পৃথিবীতে মহান রাব্বুল আলামীন যেসকল নেয়ামত দান কোরেছেন তার সবগুলোই মানুষের জন্য। মানবজাতি এক জাতি। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং অবস্থানের ভিত্তিতে বর্তমানে মানবজাতিকে যেভাবে বিভক্ত কোরে রাখা হোয়েছে তা কখনোই স্রষ্টা চান না। হিন্দু, মোসলেম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি সবাই একই আদম-হাওয়ার সন্তান। একই জায়গা থেকে তাদের উৎপত্তি। মৃত্যুর পর সবাইকে এক আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে যে বিভক্তি করা হোয়েছে তা নিছক গুটি কয়েক লোকের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে। সকল ধর্মই এক স্রষ্টা থেকে আগত, তাই সব ধর্মই একই কথা অর্থাৎ মানবতার কথা বলে। অথচ বর্তমানে ধর্মকে অতি বিশ্লেষণ কোরে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কোরে মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যবর্তী এক মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হোয়েছে মোল্লা পুরোহিত শ্রেণি। ধর্ম সবার জন্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সবার জন্য সমান। বর্তমানে সময় এসেছে এসকল মোল্লা-পুরোহিতদের কবল থেকে ধর্মকে রক্ষা করার। তাই কবি নজরুল বিপ্লবের ডাক দিয়ে বোলেছেন-

তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!
কোথা চেঙ্গিস গজনী-মামুদ, কোথায় কালা পাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যতো তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!

এদের কূপমণ্ডুকতা এবং ব্যক্তি স্বার্থের কবলে পড়ে বর্তমানে হিন্দুরা দাবি কোরছেন 'ভগবান' তাদের, মোসলেমরা মনে কোরছেন 'আল্লাহ' তাদের, খ্রিস্টানরা মনে কোরছেন 'গড' শুধুই তাদের, ইহুদিরাও মনে করে 'এলী' শুধু তাদের। কিন্তু ভগবান, আল্লাহ, গড এবং এলী যে নামেই ডাকা হোক তিনি মূলত একজনই। তিনি প্রতিটি স্থান এবং কালের জন্য যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্যও এক; আর তা হোল- অন্যায়, অত্যাচার, বিভেদ-ব্যবধান ভুলে এক আদম-হাওয়া দম্পতি থেকে আগত মানবজাতি যেন সুখে ও শান্তিতে বসবাস কোরতে পারে। আর এ জন্যই আদম (আঃ), দাউদ (আঃ), ঈসা (আঃ), মুসা (আঃ), এব্রাহীম (আঃ), মোহাম্মদ (সাঃ), কৃষ্ণ (আঃ), বুদ্ধ (আঃ) সহ যত মহামানব পৃথিবীতে এসেছেন তাদের ডাক একই ছিল।

আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর,-বিশ্বের সম্পদ।

কিন্তু তাদের আনীত শিক্ষা এবং আদর্শকে এই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা পুরোহিতরা অবিকৃত অবস্থায় থাকতে দেয় নি। আজকের ধর্মান্ধদের কাছে সাতদিনের অভুক্ত ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবার চাইতে নামাজ পড়া বেশি জরুরি, তাদের কাছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের চাইতে মসজিদ, মন্দির বেশি সম্মানিত, যদিও স্রষ্টা মানুষের কল্যাণের জন্যই মসজিদ, মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রসুলের সময় মসজিদ ছিল গরীব ধনী সব মানুষের আশ্রয়স্থল, সেটা কখনোই তালাবদ্ধ থাকতো না। এই ধর্মান্ধরা গরিবদেরকে ঘৃণা কোরে, মানুষের হক নষ্ট কোরে, মানবতার গলায় বিভক্তির ছুরি চালিয়ে ধর্মগ্রন্থকে চুমু খায়। এরা বুঝতে চায় না যে ঐ ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টা মানুষের জন্যই নাজেল কোরেছেন, মানবতার মুক্তির জন্য দান কোরেছেন। কাজেই মানবতার গলায় ছুরি চালিয়ে যতোই ধর্মগ্রন্থে চুমু খাওয়া হোক না কেন তা যে স্রষ্টার অপছন্দ তা বুঝতে তাদের মতো পণ্ডিত হবার প্রয়োজন নেই, মানুষ হওয়াই যথেষ্ট। তারা বুঝতে পারে না যে, স্রষ্টার কাছে হাজারও মসজিদ, মন্দির, ধর্মগ্রন্থের চাইতে একটা বুভুক্ষু হাড্ডিসার দুর্বল মানুষের দাম অনেক বেশি। কারণ সেই মানুষের মাঝেও তাঁর রূহ বিরাজ করে। সেই মানুষ কষ্ট পেলে তিনিও কষ্ট পান। নজরুল বলেন,

মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি'
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!

মাননীয় এমামুয্যামানের তোলা কবি নজরুলের অসুস্থ অবস্থার ছবি

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজনৈতিক হাতিয়ার

রুফায়দাহ পন্নী

ভারতে কিছুদিন আগেই হোয়ে গেল হিন্দু মোসলেম দাঙ্গা। উত্তর প্রদেশের মোজাফফরবাদে সংঘটিত এ দাঙ্গায় ৩৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হোয়েছে। ২০১৩ এর প্রথম নয় মাসে ১০৭ জন মানুষ ভারতে দাঙ্গায় মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ কোরেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানব ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য কলঙ্কজনক অধ্যায়। ধর্মের নামে উন্মাদনা একটি অধর্মীয় কাজ যা আল্লাহ ও রসুলের বাঞ্ছিত নয়। আল্লাহর রসুলের প্রকৃত উম্মাহ এসে যেখানে আল্লাহর প্রেরিত শেষ জীবনব্যবস্থা এসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানেই সৃষ্টি হোয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ভারত উপমহাদেশে এসলাম প্রবেশ করে ১৩০০ বছর আগে। মোহাম্মদ বিন কাসেম হিন্দু ও বৌদ্ধদেরকে আহলে কেতাব হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ফলে হিন্দু ও মোসলেমের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়। তবে ভারতের সর্বত্র এসলাম বিস্তার লাভ করে প্রায় এক হাজার বছর আগে। যে এসলামটি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা প্রকৃত এসলাম ছিল না। কোনো জীবনব্যবস্থাই চারশ' বছরে তার মূল রূপ হারিয়ে ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। তবু এসলামের যে শিক্ষাগুলি তখনও অবশিষ্ট ছিল তার প্রভাবে ১০০০ বছরের মোসলেম শাসনামলে উল্লেখযোগ্য কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস নেই। হিন্দু-মোসলেম এর মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি হোয়েছে মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে। সভ্য ভাষায় তারা এই নীতিকে বলে "ডিভাইড এন্ড রুল" নীতি। এটাই ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সূতিকাগার। মাত্র কিছুদিন আগে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি মার্কেন্ডি কাতজু বোললেন, ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বোলতে গেলে ছিলই না। হিন্দু ও মোসলেমের মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, কিন্তু শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও হিন্দু ও মোসলেম একতাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বিদ্রোহ দমনের পরে ব্রিটিশ সরকার

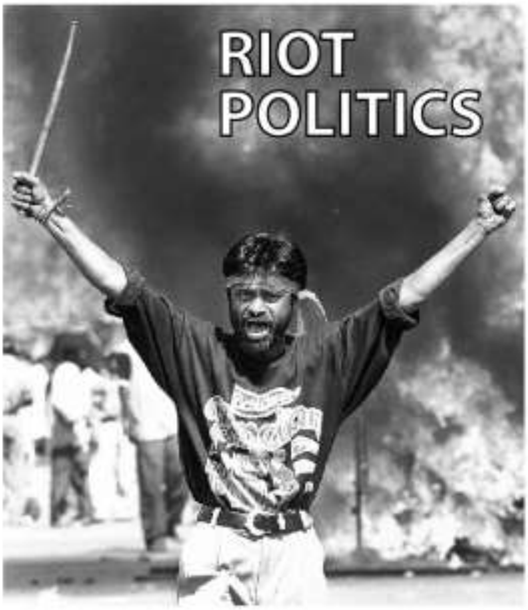

ভারতীয়দেরকে ঐক্যহীন করার জন্য Divide and Rule নীতি গ্রহণ করেন।" ভারতে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ১৯২১-২২ সনে দক্ষিণ মালাবার এলাকায়। ব্রিটিশরা ১৯৪৭ এ এই উপমহাদেশকে আপাতঃ স্বাধীন করে চোলে গেলেও যাওয়ার আগে ধর্মের ভিত্তিতে পাক-ভারতকে ভেঙ্গে ভাগ ভাগ করে রেখে যায় যে ভাগগুলি বিগত বছরগুলিতে নিজেদের মধ্যে বহু যুদ্ধ কোরেছে এবং আজও একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। সরকারি হিসাবমতে দেশবিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেবল কাশ্মীরেই গৃহহীন হোয়েছে ২ লক্ষ পরিবার। নিহত হোয়েছে হাজার হাজার, ধর্ষিতার কোনো শুমারি নেই। এমনকি আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনেও সাম্প্রদায়িক চেতনা বেশ শক্তিশালীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার কোরতে পারবে না।

আজও ভারতসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই কিছু না কিছু সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে চলেছে। এ সহিংসতা থেকে মুক্তির পথও আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি সেই পথে না গিয়ে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক Divide and Rule নীতির কুফলকে ললাট-লিখন হিসাবে মেনে নেই, তাহলে এই দাঙ্গা কোনদিনই বন্ধ হবে না। আর্মি, পুলিস দিয়ে পিটিয়ে একে নির্মূল করা যাবে না। কারণ এক ধর্মের অনুসারীরা সুযোগ পেলেই অন্য ধর্মের বিধাতা ও ধর্মপ্রবর্তকদেরকে গালি দিয়ে, কার্টুন এঁকে, সিনেমা বানিয়ে ঘৃণা বিস্তার করেন। ফলে নিভু নিভু আগুন আবার জ্বলে ওঠে। তারচেয়ে বড় কথা এই দাঙ্গা এখন যতটা না সাম্প্রদায়িক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। ব্রিটিশরা যেমন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার কোরেছে, ষড়যন্ত্র করে হিন্দু ও মোসলেমের রক্ত ঝরিয়েছে, আজও ঠিক সেভাবেই তাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এতদঅঞ্চলের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী নেতানেত্রীরা ধর্মকে ব্যবহার করে ভোটযুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা করেন। দেরিতে হলেও ভারত সরকার এই সত্যটি উপলব্ধি কোরে দাঙ্গা চলাকালে কোনও দলের কোনও নেতাকেই মোজাফফরবাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় নি। রাজ্য সরকারের পুলিশ মুজাফফরাবাদে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য যে এফআইআর করেছে, তাতে রয়েছে একাধিক বিজেপি বিধায়কের নাম। সুতরাং দাঙ্গার রাজনীতির মধ্যে ভোটের রাজনীতি যে মিশে যাচ্ছেই তা অস্বীকার কোরতে পারছেন না কেউই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বড় উদাহরণ রুয়ান্ডা, মায়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। প্রতিটি দেশেই তলিয়ে দেখলে এই একটি সত্য প্রতীয়মান হয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকারী বহু-সাম্প্রদায়িক একটি সমাজ কী কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয় এবং কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা অনস্তিত্ব থেকে এসে একেবারে সমাজের প্রধান প্রভাববিস্তারকারী দ্বন্দ্ব হিসাবে আবির্ভূত হয় সেটা বিশ্লেষণ করে যুদ্ধ গবেষক Lutz F. Krebs তার Ethnicity, Political Leaders and Violence প্রবন্ধে সুস্পষ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন যে, Elites play an evident role in promoting conflict অর্থাৎ সমাজের উঁচু শ্রেণি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পৃষ্ঠপোষণ ও উত্তেজনা প্রবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হোয়েছিল মায়ানমার মোসলেম গণহত্যা প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন। সেখানে মিয়ানমার বিষয়ক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিন দিন এর বরাত দিয়ে বলা হয়, "সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে মিয়ানমারের বিরোধীদলীয় নেত্রী শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সু চি রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর গণহত্যার ব্যাপারে কোনো কথা বলছেন না। নির্বাচনে বৌদ্ধদের ভোট পাওয়ার আশায় রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে নীরব রয়েছেন তিনি।" অথচ ঐ মুহূর্তে দাঙ্গার কারণে প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান আশ্রয় শিবিরে, খোলা আকাশের নিচে, বন-জঙ্গলে কিংবা নৌকায় ভাসমান অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। আমাদের দেশেও গত ৪০ বছরে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষগুলি হোয়েছে তার প্রায় সবগুলিই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ইন্ধনে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় হোয়েছে। কেউ ভোটের জন্য, কেউ ইস্যু সৃষ্টি করে আন্দোলনের মাঠ গরম করার জন্য এই সংঘর্ষগুলি বাঁধিয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা রামুর বৌদ্ধমন্দির ধ্বংসের ঘটনার প্রসঙ্গে বলেন, রামুর ঘটনা ধর্ম নিয়ে ঘটে নি। ঐদিন আমাদের দেশের প্রায় সব জাতীয় পত্রিকায় এ খবরটি এসেছে। কোনো ধর্মেই অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে আক্রমণ করার, তাদের বিরুদ্ধে

ঘৃণা বিস্তার করার জন্য অনুমতি দেয় না। তাই ধর্মের দ্বারা উৎসাহিত হোয়ে কোনো পক্ষ এই দাঙ্গা বাধিয়েছে এমন ধারণা অবান্তর।

যে ক'টি উদাহরণ এখানে দিলাম আশা করি উন্মুক্ত মনের পাঠকের বোঝার জন্য সেগুলি যথেষ্ট হবে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসানকল্পে কত শত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, বাণী দিচ্ছেন জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, মায়াকান্না করছে ধর্মগুরুরা, মোনাজাত করা হোচ্ছে মসজিদে, মাহফিলে, এস্তেমায় আর হজে। তবু অসহায় গৃহহীন আর স্বজনহারা মানুষের কান্নার ধ্বনী তীব্র থেকে তীব্রতর হোচ্ছে। অথচ এই সমস্যার সমাধান আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন ১৪০০ বছর আগেই। আমাদের উপমহাদেশের কথাই বলি। ভারতের ১০০০ বছরের মোসলেম শাসনের ইতিহাস মানুষকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে। প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী যত যুদ্ধ করেছিল সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে সেখানে আল্লাহর বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তার ধর্ম ত্যাগ করে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোনো অসুবিধা পর্যন্ত না কোরতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। ভারতবর্ষে এই দীর্ঘ সময়ে যদি হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরকরণে বাধ্য করা হতো, ভারতবর্ষে একটি হিন্দু পরিবারেরও থাকার কথা ছিল না (অবশ্য শেষ দিকে কিছু রাজা, নবাবরা বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা যা মোসলেম জাতির আদর্শচ্যুতির পরিণাম)। কিন্তু বাস্তবে ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মোসলেমের বহুগুণ বেশি। এসলামের স্বর্ণযুগে মধ্যপ্রাচ্যসহ অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে মোসলেম শাসিত এলাকায় ইহুদি-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লক্ষ লক্ষ

ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্রিটিশদের বাধিয়ে দেওয়া হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় নিহতদের লাশ যাদের গোরস্তান বা শ্মশান কোনোটাই জোটেনি। ১৯৪৬ সনে কলকাতা শহরের একটি গলি।

মানুষের বাস ছিল। যদি মোসলেমরা কাউকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য বাধ্য করত, তবে আজকের ইসরাইলে, সিরিয়া, লেবানন, মিশরে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে অন্যধর্মের কোনো লোকই থাকতো না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধকল্পে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই সচেতনতা সৃষ্টি করা যে, প্রতিটি ধর্মই এক স্রষ্টা থেকেই আগত, যেমন প্রতিটি মানুষ একই বাবা-মায়ের সন্তান, স্বভাবতঃই সকল ধর্মের অবতারগণও সেই একক স্রষ্টারই প্রেরিত। এই সত্য যে জানবে সে কি পারবে অপর ধর্মের নবী-রসুল-অবতারগণকে গালি দিতে? সুতরাং মানুষ যদি সত্যিই চায় এই সমস্যার সমাধান কোরতে, তবে তার পদ্ধতি আল্লাহ দিয়েছেন, আমরা সেটা পেশ কোরছি। এটা যদি মানুষ গ্রহণ না করে তবে এই অন্যায়, অশান্তিই তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

প্রথম আলো

২৪ দিনে ৩১৯টি মন্দির বাড়ি-দোকানে হামলা

৩২ জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা

ভারতের মুজাফ্ফরনগরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণের শিকার ৪,৫০০ মুসলিম বাস কোরছে উত্তর প্রদেশের শামলি জেলার উদ্বাস্তুশিবিরে। (INDIA RESISTS, 1.1.14)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুদের দেব-দেবীদের মন্দির আর প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়, মুসলিমদের মসজিদ আর ধর্মগ্রন্থ হয় ভস্মীভূত, পদদলিত।

সকল ধর্মেই ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ

শফিকুল আলম উখবাহ্

ধৈর্যশীল"। (সুরা বাকারা ১৭৫-১৭৬)

মোসলেম নামক এই জনসংখ্যাটির মধ্যে যে শ্রেণিটি বিভিন্নভাবে ধর্মকে রোজগারের পথ হিসাবে ব্যবহার কোরছে এবং যারা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যও ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন কোরছে তারা আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী নিকৃষ্টতম জাহান্নামী। তাদের অনুসরণ কোরতে আল্লাহ সরাসরি নিষেধ কোরেছেন। তিনি বোলেছেন, "তোমরা তাদের আনুগত্য করো, যারা তোমাদের কাছে বিনিময় চায় না এবং যারা সঠিক পথে আছে।" (সুরা ইয়াসীনের ২১)

তথাপিও বর্তমানের বিকৃত এসলামে পয়সা ছাড়া কিছুই হয় না, মুর্দা দাফনেও পয়সা দিতে হয়। মোল্লাদের শিষ্য অর্থাৎ তালবে-এলেম থেকে শুরু করে পীরে কামেল, গাউস কুতুব, মুফতি, শায়খ, আল্লামাগণ পয়সা ব্যতীত কেউই ধর্ম-কর্ম করেন না। শুধু তাই নয়, তারা যে মানুষকে এসলাম থেকে সরিয়ে রাখতে চায় এবং ধর্মকে পুঁজি কোরে সম্পদের মালিক হোতে চায় সেটাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাষায়। তিনি বোলেছেন, "হে মো'মেনগণ! আলেম ও সুফিদের (আহবার ও রোহবান) মধ্যে বহুসংখ্যক তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ কোরে চোলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানবজাতিকে ফিরিয়ে রাখছে (সুরা তওবা ৩৪)।

এসলাম ধর্মের মতো সনাতন ধর্মের (হিন্দু) মধ্যেও একই অবস্থা। সনাতন ধর্মেও গজিয়ে উঠেছে পুরোহিত শ্রেণি, ধর্ম যাদের কুক্ষিগত। বিনিময় ছাড়া তারা ধর্মের কোনো কাজই করেন না। ধর্ম যখনই বাণিজ্যের মাধ্যম হয় তখনই ধর্মের মধ্যে আসে বিকৃতি। এ কারণেই সনাতন ধর্মও আজ চূড়ান্ত বিকৃত। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে সনাতন ধর্মের অনুসারীগণ আজ অনেক দূরে অবস্থান কোরছে ফলে ধর্ম তাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।

এক সময় সনাতন ধর্মের অনুসারীরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ধর্মশাস্ত্র (বেদ, গীতা, মনুসংহিতা প্রমুখ) দিয়েই সমাজনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ প্রথা ইত্যাদি পরিচালনা কোরতো। তখন সমাজে ছিলো অনাবিল শান্তি, তখন ধর্ম কারো স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যাবহৃত হোত না, তখন ধর্মের কোন বিনিময় নেওয়া হোত না, ধর্ম তখন মানবতার কল্যাণ কোরত। সনাতন ধর্মের ধর্মশাস্ত্রগুলো অবতারের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই পাঠিয়েছেন। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না তাই তিনি ধর্ম বাণিজ্য নিষেধ কোরেছেন। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্ বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালং প্রেত্য জায়তে।।২৪।।

অনুবাদ: যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কখনও কর্তব্য নয়। কারণ যজ্ঞ কোরতে মৃত্যুর পর প্রবৃত্ত হ'য়ে ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করলে চণ্ডাল হ'য়ে জন্মাতে হয়।

যজ্ঞার্থমথং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।।২৫।।

অনুবাদ: যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হ'য়ে থাকে।

দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি।।২৬।।

অনুবাদ: যে লোক লোভবশত: দেবস্ব অর্থাৎ দেবতার ধন এবং ব্রহ্মণস্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সেই পাপিষ্ঠকে পরলোকে শকুনির উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে জীবন ধারণ কোরতে হয়।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আল্লাহর দয়ায় আল্লাহর সত্যদীনের প্রকৃত রূপকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি কোরেছেন এবং নবীর উম্মত হিসাবে সেটিকে মানবজাতির সামনে প্রকাশ কোরেছেন। তাই হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও এই বিকৃত ধর্মের আলেম ওলামার প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হোতে হোয়েছে। এটা বিশ্বনবীর সুন্নাহ। বিশ্বনবী (দ:) বোলে গেছেন যে, এই দীনের ভবিষ্যতে যখন বিকৃত হবে তখন যে ভয় না কোরে দাঁড়িয়ে দীনের প্রকৃত রূপ প্রচার কোরবে তার স্থান (দরজা) নবীদের স্থানের চেয়ে মাত্র এক দরজা নিচু হবে। অন্য হাদিসে বলা আছে তার সওয়াব (পুণ্য) একশ' শহীদের সমান হবে। শোকর আল হামদোলেল্লাহ। তবে আমরা চাই এ জাতির সত্যনিষ্ঠ আলেম ওলামাদের কালঘুম ভাঙুক। তারাও আল্লাহর প্রকৃত তওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন। তাদের প্রতি আমাদের কথা হোচ্ছে:

আজ এই হতভাগ্য জাতিসহ সমস্ত মানবজাতি শেরক ও কুফরে ডুবে আছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে তাগুতের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ এই উম্মাহকে শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ বোলেছেন (সুরা এমরান ১১০)। আপনারা সামান্য কিছু অর্থ লাভের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হোয়ে ছোট হোয়ে থাকবেন না। এই হতভাগ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদেরও আছে। তাগুতের পূজারীরা মনে করে আপনাদেরকে অর্থের বিনিময়ে তাদের পছন্দমত ফতোয়া দেওয়ানো যায়। পরমুখাপেক্ষী যারা হয় তাদের আর মেরুদণ্ড বোলতে কিছু থাকে না। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা বেশিদূর এগুতে পারে না। বড় কোনো কোরবানি করার আত্মিক শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে। তাই আপনারা এই জাতির কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে ধর্মব্যবসা পরিত্যাগ কোরুন এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ ভুলে, মতবিরোধ ত্যাগ কোরে তওহীদের উপরে ঐক্যবদ্ধ হোন। এই কাজ কোরতে গিয়ে আপনাদেরকে হয়তো কিছু অর্থকষ্ট সহ্য কোরতে হোতে পারে, তবু ভয় পাবেন না। আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কাল রেখে হারাম উপার্জন বন্ধ কোরুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম রেযেকের বন্দোবস্ত কোরে দেবেন এবং আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর কোরে দেবেন।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

সনাতন কথা : রিয়াদুল হাসান

ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর রসুল মনু (আঃ)

[মাননীয় এমামুয্যামান তাঁর বিভিন্ন লেখায় মনু, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, মহাবীর, বুদ্ধসহ ভারতবর্ষের বেশ কয়েকজন মহামানব সম্পর্কে বোলেছেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে আল্লাহর রসুল ছিলেন। তিনি বইতে লিখেছেন যে তাঁর এই অভিমত তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণার ফল, তিনি এই অভিমত অন্য কাউকে গ্রহণ কোরতে জোর করেন নি। দেশেরপত্রের পাঠকদের জন্য ইতোপূর্বে আমরা রাজা রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের নবী/রসুল হওয়ার বিষয়ে বেশ কিছু যুক্তি ও প্রমাণ তুলে ধোরেছি। এবারে আমরা লিখছি মহর্ষি মনুকে নিয়ে যিনি আমাদের সকলের কাছে নুহ নবী হিসাবে পরিচিত।]

সপ্তর্ষিকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্লাবনে ভাসছে মনু (আঃ) এর নৌকা। তাঁদেরকে পথ দেখাচ্ছেন মৎস্যরূপী বিষ্ণু (স্রষ্টা) স্বয়ং। মহাভারত (বনপর্ব) ও মৎসপুরাণের বর্ণনামতে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি।

মানুষের ইতিহাসে নুহ (আ:) একটি অবিচ্ছেদ্য নাম। কোর'আন হাদিস তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে নুহের প্লাবন সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ রোয়েছে এবং স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে চরিত্রের নামের ভিন্নতা আর কাহিনীর ছোট-খাট পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলেই নুহের (আ:) মহাপ্লাবনের কাহিনী প্রচলিত রোয়েছে। তওরাত ও বাইবেলে এই ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত আছে এই সব গ্রন্থে তাঁকে নোহ (Noah, Nukh) নামে আখ্যায়িত করা হোয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে সেমিটিক অ্যামোনাইট জাতির মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত উপকথা 'ইনুমা এলইশ'-এও সেই মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে। সেখানে নুহ (আ:)-কে বলা হোয়েছে রাজা জিউসুদ্র। একইভাবে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী, রোমান পৌরাণিক কাহিনী, আসামের আদিবাসী লুসাইদের লোকগাঁথায়, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ললোবাসীদের লোকগাঁথায়, পূর্ব আফ্রিকার মাসাইদের আঞ্চলিক গাঁথায়, উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান উপজাতিদের লোকগাঁথায় পর্যন্ত নুহের (আ:) মহাপ্লাবনের (Deluge) কথা উল্লেখিত আছে।

এছাড়া মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ মৎস্যপুরাণের মূল প্রেক্ষাপটই হোচ্ছে এই মহাপ্লাবনের ঘটনা। প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতেও এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ রোয়েছে। কোর'আন, হাদিস ও বাইবেলের বর্ণিত ঘটনা থেকে এই বিবরণের কিছুটা তারতম্য থাকলেও মূল বিষয়গুলি সম্পূর্ণ এক। নুহ (আ:) সম্পর্কে কোর'আন ও হাদিসে যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সারসংক্ষেপ হোচ্ছে এমন:

আবুল বাশার সানী বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বোলে খ্যাত নবী নুহ (আ.) ছিলেন পিতা আদম (আ.) এর দশম অধঃস্তন প্রজন্ম। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে প্রথম কেতাবপ্রাপ্ত বার্তাবাহক অর্থাৎ রসুল [আবু হোরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বোখারী ও মোসলেম]। তিনি ৯৫০ বছর নিজের জাতির উদ্দেশ্যে তওহীদের আহ্বান জানান। জাতি যখন তাঁর আহ্বান অস্বীকার করে তখন তিনি আল্লাহর কাছে জাতির জন্য ধ্বংস কামনা করেন। বলেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট কোরবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের (সুরা নুহ ২৬-২৭)। এরপর

আল্লাহ তাঁকে জানালেন আসন্ন গজবের সংবাদ এবং তাঁকে একটি বড় নৌকা নির্মাণ কোরতে বোললেন। নৌকা নির্মিত হোলে আল্লাহ হুকুম দিলেন প্রতিটি প্রাণীর মধ্য থেকে এক জোড়া কোরে সেই নৌকায় তোলার জন্য। এরপর এলো ঘোষিত সময়। জমিন থেকে প্রবল বেগে পানি উৎক্ষিপ্ত হোতে থাকলো এবং আকাশ ভেঙে অবিরাম বর্ষণ শুরু হোল।

আল্লাহ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে সকল কাফেরকে ধ্বংস কোরে দেন। নুহ (আ.) এর চার পুত্র ছিল: সাম, হাম, ইয়াফেছ ও ইয়াম অথবা কেনান (Bible এ Shem, Ham, Japheth and Canaan)। প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্তজন কাফের হোয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়। নুহ (আ.) এর আহ্বানে তাঁর কওমের হাতেগোনা মাত্র কয়েক ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকায় আরোহণের মাধ্যমে মুক্তি পান। তাদের দ্বারাই আবার পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ঘটে। ফলে ইহুদি-খ্রিস্টানসহ সব ধর্মমতের লোকেরা নুহ (আ.)-কে তাদের পিতৃপুরুষ হিসেবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ২৮টি সুরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হোয়েছে। বন্যার পরে তিনি ইরাকের মসুল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস কোরতেন বোলে গবেষকদের অভিমত। তিনি প্রায় দু হাজার বছর ধরাপৃষ্ঠে ছিলেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নুহ (আ:) এর ঘটনা

মহাভারত ও মৎস্যপুরাণে মহর্ষি বৈবস্বত মনু নামে একজন রাজার উল্লেখ রোয়েছে যার জীবনের ঘটনা নুহ (আ:) এর ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বাংলা মানব বা মানুষ শব্দটির উৎপত্তি এই মনু শব্দ থেকেই (সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৫৭২-৫৭৩)। হিন্দু শাস্ত্রমতে ভগবান বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে একটি অবতার "মৎস্য বা মাছ অবতার"-এর কথা বলা হোয়েছে। মৎস্য অবতার আবির্ভাবের যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত আছে, তা সংক্ষিপ্ত করে বোললে-

পুরাকালে মহাবল-পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী অসামান্য-রূপসম্পন্ন বৈবস্বত মনু নামে এক মহর্ষি রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র ইক্ষাকুর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ কোরে মলয়চলের একদেশে গিয়ে বিপুল তপস্যা করেন। বহু বর্ষ অতীত হোলে ব্রহ্মা (স্রষ্টা) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোয়ে বরদানে উদ্যত হোলেন এবং বোললেন, 'রাজন! বর গ্রহণ করো। ব্রহ্মার কথায় তাঁকে প্রণিপাত কোরে মনু বোললেন, **'হে পিতামহ! আমি আপনার নিকট একটিমাত্র বর ইচ্ছা কোরি। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হবে, তখন আমি যেন জীবসকলসহ সমগ্র জগতের রক্ষা কোরতে সমর্থ হই।'** বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বোলে অদৃশ্য হোলেন। কিছু পরেই মনু চারিণী নদীতে নেমে তপস্যা কোরছিলেন। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার মানসে তিনি এক অঞ্জলি পানি হাতে নেন আর হাতে একটি ছোট মাছ উঠে আসে। মাছটি বলে, 'ভগবান! বড় মাছেরা ক্ষুদ্র মাছদের ভক্ষণ কোরবে এটাই বিধাতার বিধান। কিন্তু আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য, মহাবল মৎস্য দ্বারা অতিশয় ভীত হোয়েছি। আমাকে রক্ষা কোরুন।' মহর্ষির দয়া হোল। তিনি মাছটিকে মাটির পাত্রে রেখে সন্তানের ন্যায় যত্নে পালন কোরতে লাগলেন।

মাছটি এক দিন না যেতেই ষোল আঙ্গুল পরিমাণ বড় হোয়ে গেল। সে রাজাকে বোলল, 'হে রাজন! আজি আমাকে স্থানান্তর কোরে রক্ষা কোরুন।' মনু তৎক্ষণাৎ মাছটিকে একটি মাটির জালার মধ্যে রাখলেন। সেখানে মাছটি এক রাতেই তিন হাত পরিমাণ বড় হোয়ে গেল। তখন মাছ পুনরায় আর্তস্বরে মনুকে বোলল, 'আমি আপনার শরণাপন্ন হোয়েছি। আমাকে রক্ষা কোরুন।' মনু তাকে দুই যোজন লম্বা, একযোজন চওড়া দিঘীতে নিক্ষেপ কোরলেন। মাছটি বহু বৎসর সেখানে অবস্থান কোরে বড় হোয়ে উঠলো। ক্রমে ক্রমে অতি বৃহৎ সেই দিঘিও তার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হোয়ে উঠলো। তখন মনু তাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কোরলেন। সেখানে কিছুকাল বাস কোরে সে আরও পরিবর্ধিত হোয়ে মনুকে বোলল, 'ভগবন্! আমার দেহ আরও বিস্তীর্ণ হোয়েছে; এখন এই স্থানেও আমি আর নড়াচড়া কোরতে পারি না। অবিলম্বে আমাকে সাগরে নিক্ষেপ কোরুন।' অতঃপর মহর্ষি মনু তাকে নিয়ে সমুদ্রের অভিমুখে চোললেন। বিশালবপু মাছটিকে বহন কোরতে তাঁর কোনই কষ্ট হোল না। তিনি সাগরতীরে উপস্থিত হোয়ে তাকে পানিতে নিক্ষেপ কোরলেন। সে নিজের দেহে যখন সমগ্র সমুদ্র পরিব্যাপ্ত কোরল, তখন মনু ভীত হোয়ে তাঁকে বোললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বয়ং বাসুদেব (বিষ্ণু) মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হোয়েছ। তোমায় আমার নমস্কার।' তখন মৎস্যরূপী বিষ্ণু বোললেন, 'হে নিষ্পাপ! আপনি আমায় সত্যিই চিনতে পেরেছেন। শুনুন, এখন একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটার সময় উপস্থিত। পাহাড়, বনসহ সমস্ত পৃথিবী অচিরেই জলমগ্ন হবে। আপনি সুদৃঢ় একখানি নৌকা নির্মাণ করবেন আর সপ্তর্ষীগণসহ যাবতীয় জীবের বীজ নিয়ে ঐ নৌকায় আরোহণ কোরে আমার জন্য প্রতীক্ষা কোরবেন। পরে আমি শিংবিশিষ্ট মাছ হোয়ে আবির্ভূত হবো। আমাকে ছাড়া আপনি সেই দুস্তর সলিলরাশি থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবেন না।'

এরপর শুরু হোল শতবর্ষব্যাপী প্রবল খরা। দারুণ দাবদাহে পৃথিবী ছাইবর্ণ হোয়ে গেল। কোথাও এক ফোটা পানি নেই। এরপর এলো সেই প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতসহ মহাপ্লাবন। বিশ্বচরাচর প্লাবিত হোয়ে এক মহাসমুদ্রের রূপ নিল। শিংবিশিষ্ট মৎস্যরূপে ভগবান বিষ্ণু আসলেন। মনু তাঁর শৃঙ্গে রজ্জু বন্ধন কোরলেন। তিনি তখন মহাবেগে

নৌকাকে টেনে নিয়ে সমুদ্রে বিচরণ কোরতে লাগলেন। মহাপ্লাবনে সকল মানুষে বিলীন হোয়ে গেলো, কেবল সপ্তর্ষিগণ, মনু ও মৎস্যই দৃশ্যমান থাকলেন। মৎস্য এইভাবে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকাসহ বিচরণ কোরতে লাগলেন। অতঃপর একটি পর্বতের চূড়া দৃশ্যমান হোলে মৎস্য সেদিকে নৌকা নিয়ে চোললেন। সেখানে নৌকা বাঁধা হোল।

এরপর মৎস্য নৌকারোহীদের বোললেন, 'হে মহর্ষিগণ! আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা; মৎস্যরূপ নিয়ে এই বিপদ থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার কোরলাম। এখন এই বৈবস্বত মনু সকল প্রকার জীবজন্তু ও মানুষ সৃষ্টি কোরবেন।' বন্যার পানি কমতে লাগলো। পৃথিবী পুনর্নির্মাণের জন্য মনু ও তার পরিবার পাহাড় থেকে ভূমিতে নেমে এলেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে বংশবিস্তারের মাধ্যমে মানব প্রজাতি টিকিয়ে রাখলেন।

কোর'আনের বর্ণনার সঙ্গে মহাভারত ও মৎসপুরাণের বর্ণনার বিশেষ সামঞ্জস্যগুলি খেয়াল কোরুন:

মহাভারত ও মৎস্যপুরাণ	কোর'আন	মহাভারত ও মৎস্যপুরাণ	কোর'আন
⇨ স্রষ্টার নির্দেশে বিরাট নৌকা নির্মাণ।	⇨ এরপর আল্লাহ আদেশ কোরলেন, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহি অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো। (সুরা মো'মেনুন- ২৭)।	⇨ সকল প্রাণীর প্রজাতি নৌকায় তোলা ও বন্যার পরে আবার সেসব প্রজাতির বিস্তার ঘটানো।	⇨ তার সাথে যারা নৌকায় ছিল, তাদের সবাইকে উদ্ধার কোরেছি, আর যারা আমার আজাবসমূহকে মিথ্যা বোলেছে, তাদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছি। (সুরা আরাফ ৬৪)।
⇨ স্রষ্টার পূর্বঘোষিত মহাপ্লাবনে ও বারিবর্ষণে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হওয়া।	⇨ অবশেষে আমার আদেশ এসে পৌঁছল এবং চুলো উথলে উঠলো, আমি বললাম, প্রত্যেক জীবের এক একজোড়া এতে উঠিয়ে নাও, তোমার পরিবার-পরিজনদেরও ওঠাও তাদের বাদ দিয়ে, যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত হোয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে; তার সাথে খুব কম সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো (সুরা হুদ ৪০)।	⇨ সকল মানুষ ধ্বংস হওয়ার পর কয়েকজন থেকে আবার মানবজাতির বংশবিস্তার ঘটানো।	⇨ আমরা তার (নুহের) বংশধরদেরই অবশিষ্ট রেখেছি (সুরা ছাফফাত ৭৭)।
⇨ নৌকায় চড়ে স্রষ্টার সহায়তায় মনু ও ঋষিদের উদ্ধার পাওয়া। উদ্ধারপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প (সাতজন)।			

সুতরাং বৈবস্বত মনুই যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসহ কোর'আনে বর্ণিত নুহ (আ:) সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকে না। মানবজাতি ধ্বংস হোয়ে আবার মনু (আ:) থেকে শুরু হোয়েছিল, তাই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে মনুকে মানবজাতির আদিপিতা বোলে অভিহিত করা হয়। ঋগ্বেদে এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে মনুকে মনুষ্যজাতির জনক আদিপিতা, পুরাতন ঋষি, অগ্নিদেবের সংস্থাপক, অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা, কৃতযুগের রাজা প্রভৃতিরূপে উল্লেখ করা হোয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি বোলছেন- "প্রজাপতি (ব্রহ্মা) মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মনুই প্রজাদের মধ্যে তা প্রচার করেন।"- "প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ" (৩.১১.৪)। তৈত্তিরিয় সংহিতায় মনু থেকেই প্রজা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হোয়েছে।

পণ্ডিত শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে- "মনু ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা এক এক জন মনু এবং তাঁদের নামানুসারেই সেই জাতির জীবিতকালকে 'মন্বন্তর' বলা হয়।" প্রসিদ্ধ মত হোচ্ছে মোট মনু ছিলেন চৌদ্দজন। এই চতুর্দশ মনুর মধ্যে বৈবস্বত মনুকেই বর্তমান মনুষ্যজাতির মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ বোলে বিশ্বাস করা হয় (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান পৃ:৫৫৮)। আর মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই বৈবস্বত মনু এবং নুহ (আ:)-কে একই ব্যক্তি এবং আল্লাহর রসুল বোলে উল্লেখ কোরেছেন। তাঁর এ প্রস্তাবনার পক্ষে আরও যুক্তি ও প্রমাণ রোয়েছে তবে উন্মুক্ত হৃদয়ের যতটুকু আজ উল্লেখ করা গেলো ততটুকুই আশা কোরি যথেষ্ট।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪০৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?

হুমায়ূন কবীর

শ্রীমদভাগবতগীতার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণের সঠিক পরিচয়কে উদ্ঘাটন কোরতে গিয়ে বহু মনীষী, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি সুগভীর গবেষণা কোরেছেন। তাদের অনেকেই অভিমত দিয়েছেন যে, আল্লাহ সকল জাতিগোষ্ঠীতে ও জনপদে ঐ এলাকার ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সহকারে তাঁর নবী-রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ঐ নবীদের বিদায়ের পরে তাঁর শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থ বিকৃত কোরে ফেলা হোয়েছে। ফলে ঐ এলাকার মানুষকে নতুন কোরে পথ দেখাতে আবির্ভূত হোয়েছেন অন্য নবী যারা পূর্বের বিকৃত গ্রন্থকে রদ ঘোষণা কোরেছেন এবং নতুন বিধান জাতিকে প্রদান কোরেছেন। কেউ তাকে মেনে নিয়েছে, কেউ মেনে নেয় নি। এভাবে জন্ম হোয়েছে একাধিক ধর্মের। কালক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক এলাকার ধর্মের অনুসারীরা অন্য এলাকায় অন্য ভাষায় নাযেলকৃত ধর্মকে ধর্ম হিসাবে এবং ঐ ধর্মের প্রবর্তককে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। যেমন ইহুদিরা ঈসা (আ:) কে আল্লাহর প্রেরিত বোলে স্বীকার করে না, খ্রিস্টানরা আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে না একইভাবে মোসলেমরা ভারতীয় অঞ্চলে ভারতীয় ভাষার মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বৌদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু তাদের প্রচারিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আখেরী নবীর আগমনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত আছে যা গবেষণা কোরলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ ধর্মগুলিও আল্লাহরই প্রেরিত (যা এখন বিকৃত হোয়ে গেছে), এবং স্বভাবতই সেগুলির প্রবক্তারা আল্লাহরই বার্তাবাহক অর্থাৎ নবী ও রসুল। এমনই একজন গবেষক ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রচার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কে.এম.এ হোসাইন তার গবেষণা গ্রন্থ 'ইসলাম কি ও কেন'- তে গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের নবী হওয়ার পক্ষে বিস্তারিত যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ কোরেছেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি এমনই একটি গবেষণাকর্ম যাতে জনাব কে.এম. হোসাইনের বইসহ আরও বেশ কিছু বইয়ের সহায়তা নেওয়া হোয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দু ধর্মের অবতার বলা হোলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বোলে কোনো ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বোলে কোনো শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতায়, পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই। শব্দটি এশিয়া মাইনর, খুব সম্ভব তুর্কী দেশ থেকে এসেছে সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। উপমহাদেশে প্রচলিত এই ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম, কোর'আনে যেটাকে বলা হোয়েছে দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম, অর্থাৎ তওহীদ (কোর'আন- সুরা রুম, আয়াত ৪৩, সুরা বাইয়্যেনা, আয়াত ৫)। অবতার শব্দের অর্থ পৃথিবীতে আগমন। ঈশ্বরের অবতার বলিতে বুঝায় যে, নিখিল বিশ্বে ঐশী প্রত্যাদেশ প্রচারকারী মহামানবের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা। সেই সময় থেকেই মানবজাতি যাতে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস কোরতে পারে, মানবে মানবে হানাহানি, রক্তারক্তি, অন্যায়-অবিচার, যুলুম-অত্যাচার না করে তাই সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াতে ধারাবাহিকভাবে নবী রসুল (অবতার, মহামানব) প্রেরণ করেছেন।

আল কোর'আন বলছে,

- ➪ প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে রসুল (সুরা ইউনুস ৪৮)।
- ➪ প্রত্যেক জাতির জন্য হাদি বা পথ প্রদর্শক রয়েছে (সুরা রাদ ৮)।
- ➪ আমরা প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো না কোনো রসুল পাঠিয়েছি" (সুরা নাহল-৩৭)।
- ➪ এমন কোনো জাতি নেই, যার কাছে সতর্ককারী (নাযের) আগমন করে নাই (সুরা ফাতির -২৫)।

কোর'আনের এইসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে আল্লাহ বিভিন্ন যুগে নবী-রসুল, পথ-প্রদর্শক, সতর্ককারী ও সুসংবাদাতা পাঠিয়েছেন। মোসলেম হওয়ার শর্ত হিসাবে ঐ সব নবী-রসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থপন করা অবশ্য জরুরি। তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কোরতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। মো'মেনদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হোয়েছে,

- ➪ মো'মেনরা বলে, আমরা রসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য কোরি না (সুরা বাকারা- ২৮৫) অর্থাৎ কোনো নবীকে মানবো, কোনো নবীকে অস্বীকার করবো তা হবে না, তারা সকলেই আল্লাহর রসুল। এ বিষয়েই আল কোর'আন বলছে,
- ➪ যারা চায় আল্লাহ এবং কতককে অস্বীকার, আর তারা চায় যেন এই দুয়ের মধ্যে একটি মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কোরতে। এই সমস্ত লোকেরাই হোচ্ছে পাক্কা কাফের। মো'মেন হ'ল তারা যারা আল্লাহ এবং রসুলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে - কোনো পার্থক্য করে না (সুরা নেসা ১৫০-১৫২)।"

এইসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুগে যুগে আগত সকল নবী-রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মো'মেন মোসলেমের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরদ)। যদি একজন নবীকেও অস্বীকার করা হয়, তবে সে ব্যক্তি "সত্যিকার কাফের" হোয়ে যায় এবং

পরিণাম হোচ্ছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (সুরা বাকারা- ১৫২)।

পাঠকগণ, পবিত্র কোর'আনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হোয়েছে। হাদিস পাঠে আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দু-লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলগণের পৃথিবীতে আগমনের কথা জানতে পারি। কোর'আন বলছে-

➪ আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসুল পাঠিয়েছি, যাদের মধ্যে কারো বিষয় তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কারো কারো বিষয় বর্ণনা করি নাই (সুরা মো'মেন-৭৯)।

যদি সব নবীদের নাম-ধাম বৃত্তান্ত আল-কোর'আনে বর্ণনা করা হত তাহোলে একটি বিশ্বকোষের আকার ধারণ কোরতো। বাইবেলে বর্ণিত সকল নবীর নামও কোর'আনে উল্লেখ করা হয় নাই, আর তার প্রয়োজনও নেই। প্রত্যেক নবী-রসুলগণ তাঁদের জাতির ভাষায় তথা মাতৃভাষায় ঐশীবাণী প্রচা কোরেছেন, যাতে তাদের জাতির লোকেরা সহজেই নবীর শিক্ষাকে বুঝতে ও অনুসরণ কোরতে পারে। আর এ বিষয়েই আল-কোরআন বলছে-

➪ আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তাঁর জাতির ভাষায় পাঠিয়েছি, এই জন্য যে, যেন তাদের নিকট স্পষ্ট করে (আমার বাণী) প্রচার কোরতে পারে (সুরা এব্রাহীম-৫)।

এই আয়াতের মর্মবাণী হোচ্ছে, অতীতের প্রত্যেক নবী-রসুলগণ যে যে অঞ্চল ও জাতিতে আগমন কোরেছেন, সেই জাতি ও সেই জাতির ভাষাতেই তারা ওহী, এলহাম, দিব্যজ্ঞান, বোধি লাভ করে সেই অঞ্চলে একই ভাষা-ভাষীর মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়েছেন। ঐসব ভাষা হিব্রু পার্শী, সংস্কৃত, পালি, চীনা বা অন্য যে কোনো ভাষাই হোক না কেন। সুতরাং অতীত জাতির নবীদের জানতে হোলে আমাদের অবশ্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থগুলি যথা 'বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-গীতা-সংহীতা, উপনিষদ, মহাভারত, ত্রিপিটক, দিঘা-নিকায়া, জেন্দাবেস্তা, তওরাত-যবুর-ইঞ্জিল' ইত্যাদি গবেষণা ও পাঠ করে কোর'আনের আলোকে অতীত নবীদের সম্বন্ধে সত্যিকার পরিচয় জানতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে নিশ্চিত করে বলা যায়, ভারত উপমহাদেশেও আল্লাহ নবী-রসুল-অবতার প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রচারিত বাণী-ঐশীগ্রন্থ বিকৃত অবস্থায় হলেও ঐ জাতির মধ্যে এখনও বংশ-পরম্পরায় অনুসৃত হোয়ে আসছে, তাদের ভক্ত-অনুরক্ত অনুসারীদের মাধ্যমে। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো যে, শ্রীকৃষ্ণ ও মহামতি গৌতম বুদ্ধ আমাদের প্রস্তাবিত উপমহাদেশের আল্লাহ প্রেরিত নবী-রসুল-অবতার ছিলেন কিনা।

এসলামী চিন্তাবিদ ও মোসলেম মনীষীদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

ভারতীয় মোসলেম চিন্তাবিদ ও এসলামিক দার্শনিকগণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেসব সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন এবং কোর'আন হাদিসের আলোকে তাঁর সম্বন্ধে যে বক্তব্য দিয়েছেন ঐসব মতামতও বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন নবী।

➪ মোজাদ্দেদে আলফেসানী সরহিন্দ (রা:) কাশ্‌ফে প্রায় ৩০-৫০ জন ভারতীয় নবীর সমাধি দর্শন কোরেছেন বোলে হাদীকা মাহমাদিয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

➪ ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত এসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম তাঁহার বিখ্যাত "Creed of Islam" গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধকে আল্লাহর নবী বোলে তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন এবং নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দরুদ ও সম্মানসূচক "Peace be upon him" বা আলাইহে সালাম (আ:) ব্যবহার কোরেছেন।

➪ খ্যাতনামা তাপস মির্জা মাজহার জানজানান এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা কোরতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবীরূপে স্বীকার করে 'মাকামাতে মাজহারি' গ্রন্থে উল্লেখ কোরেছেন।

➪ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতবী শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবীরূপে সত্য নবী বোলে স্বীকার করেছেন (মাবাহাসা শাহজাহানপুর সৎ-ধর্ম প্রচার)।

➪ মাওলানা জাফর আলী খান লিখেছেন, এমন কোনো জাতি বা দেশ নেই; যার দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ তা'লা কোনো নবী রসুল প্রেরণ করেন নাই। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে , শ্রীকৃষ্ণ মহান প্রভুর রেসালতের ধারায় ভারতীয় নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (প্রতাপ, ২৮ শে আগস্ট ১৯২৯)।

➪ উপমহাদেশের প্রখ্যাত এসলামী চিন্তাবিদ ও মহানবী মোহাম্মদ (দ:) এর জীবনীকার "সীরাতুন্নবীর" (দ:) রচয়িতা "আল্লামা শিবলী নোমানী, ভারতীয় নবীদের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত কোরতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য ভারতীয় নবীদের জীবনী ও সত্যিকার পরিচয় আজ নানারূপ কল্পকাহিনীর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

➪ আল-কোরআনের তাফসির গ্রন্থ "তাফসীরে ওয়াহিদী"-তে মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান অকাতরে স্বীকার করেছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহর এক প্রিয় ও সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। এবং নিজ যুগ ও জাতির জন্য খোদার পক্ষ হোতে সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হোয়েছিলেন।"

⇨ খাজা হাসান নিজামী বোলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দুস্কৃতিকারীদের বিনাশকল্পে প্রেরিত অবতার ছিলেন (কৃষণবিতি)।

⇨ উপমহাদেশের আরও একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, এসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সোলেমান নদভী হিন্দুদের পূজ্য অবতার শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধকে নবীরূপে স্বীকার করে তাঁর "সিরাত মোবারক" ১৯৮২ গ্রন্থে উল্লেখ কোরেছেন।

⇨ আল-কোর'আনের ব্যাখ্যাতা প্রখ্যাত তাফসিরকারক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফতি এবং প্রখ্যাত তাফসির গ্রন্থ "মা'আরেফুল কোর'আন" এর রচয়িতা (আটখণ্ড) মুফতি মোহাম্মদ শফি, তাঁর গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উল্লেখ কোরেছেন যে, আর্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সকল ঋষিগণই নবী-অবতার ছিলেন।

⇨ মাসিক পত্রিকা "পৃথিবীতে" মন্তব্য করা হোয়েছে যে, "গীতার শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একেশ্বরবাদী। এই পরমপুরুষের উল্লেখ করে মহানবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (দ:) বোলেছেন- "কানা ফিল হিন্দে নবীয়ান আসওয়াদুল লাওনা ইসমুহু কাহেন।" (হাদিসে দোলমী, তারিখে হামদান, বাবুল কাফ।) অর্থাৎ- "ভারতবর্ষে এক নবীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং কানাই নামে পরিচিত।" আমরা সবাই জানি যে, শ্রীকৃষ্ণের আসল নাম কানাই। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিফতি নাম। মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী' আরো উল্লেখ কোরেছে যে, ভারতের বৈদিকযুগ ছিল এসলামের যুগ।-(মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮)।

⇨ ড. রফিক জাকারিয়া এক প্রবন্ধে বিভিন্ন মোসলেম মনীষী ও ওলামাদের উক্তি উদ্ধৃতি করে লিখেছেন যে,- According to the Quaranic declarations, not only Moses and jesus, but all the Vedic Rishies of old and Rama, Krishna... ...have alike place in the hearts of the true followers of Islam" (Illustrated weekly of India. Dated 28.10.1973)।

⇨ এসলামের চতুর্থ খলিফা, জ্ঞানের দরজা নামে খ্যাত, নবী করিম (দ:) এর প্রিয়তম ভ্রাতা ও জামাতা এসলামের ইতিহাসে খ্যাতনামা সমরবিদ আলী (রা:) বোলেছেন, "আল্লাহ তা'লা কৃষ্ণবর্ণের এক নবী পাঠিয়েছিলেন, যার নাম কোর'আনে উল্লেখ করা হয় নাই।" (কাশশাফ, মাদারেক) এই বর্ণনা থেকে একজন কৃষ্ণ বর্ণের নবীর আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া গেল, যা নবী করিম (দ:) কর্তৃক ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদিসের "আসওয়াদুল ও এসমুহু কাহেন" কৃষ্ণবর্ণ ও কানাই নামে ভারতীয় নবী-অবতার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

⇨ ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরো বহু হিন্দু মোসলেম পণ্ডিত ও ভাষাবিদ সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ গবেষণা করে এমন অনেক সত্য-সনাতন বাণী খুঁজে পেয়েছেন, যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৈদিক শ্লোকগুলো ঐশীবাণী এবং বৈদিক ঋষিরা নবী-অবতার, অন্তিম-ঋষি-নরাশংস, কল্কি-অবতার মহানবী মুহাম্মদ (দ:)। ঐ সব গ্রন্থের বাণী সত্য ও প্রবক্তারা সত্যবাদী না হলে তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী কিরূপে সত্য হোতে পারে?

⇨ কবি নজরুল তাঁর মানুষ কবিতাতে লিখেছেন,

মূর্খরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, বিশ্বের সম্পদ।

এখানে পবিত্র কোর'আনে যাঁদেরকে নবী বোলে সত্যায়ন করা হোয়েছে তাদের সঙ্গে একই কাতারে কৃষ্ণ ও বুদ্ধের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, কবি নজরুল তাঁদেরকেও নবী হিসাবে বিশ্বাস কোরতেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্য কি বলে?

প্রাচীন যুগ হোতে প্রত্যেক ধর্মে কোরবানি বা উৎসর্গের রীতি চালু আছে। কোরবানির সময় এলে শ্রীকৃষ্ণ পশু কোরবানি কোরেছেন। এর মধ্যে একটি গাভীও ছিলো (ভগবত, দশম স্কন্দ, অধ্যায়-৫৮)। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা জানি তিনি ছোটবেলায় রাখাল ছিলেন, যা এসলামের অনেক নবীর জীবনীতেও আমরা পাই। এছাড়াও তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর জন্মকে ঘিরে ভবিষদ্বাণীও করা হোয়েছিলো বোলে জানতে পারি, যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে কংস রাজা বহু শিশু হত্যা করে। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করার জন্য। মহাভারতে আছে-

⇨ "ধর্মব্যুচ্ছিতি মিচ্ছিন্তো যেই ধর্মস্য প্রবর্তকঃ অর্থাৎ- যারা ধর্মের উচ্ছেদ কামনা করে অধর্মের প্রবর্তন করে, সেই দুরাত্মাদেরকে বিনাশ করা একান্ত কর্তব্য (১২/৩৩/৩০)।

⇨ ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল আপোষহীন। তিনি কোনো নতুন ধর্ম প্রবর্তন কোরতে আসেননি (ভগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৭২ পৃ.)। তিনি চির-সত্য, সনাতন ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারত বলছে, "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণ সত্যমত্রা প্রতিষ্ঠিতম (মহাভারত ৫/৮৩/১২)।

⇨ তিনি কখনো ঈশ্বরত্বের দাবি করেন নি। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। ঘর-সংসার সমাজ পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি বসবাস করেছেন। তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সবই ছিল। তিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানুষই ছিলেন। যেমন মহাভারতে বলা হোচ্ছে- "মানুষং লোকমতিষ্ঠ বাসুদেব-ইতিশ্রুত (মহাভারত ৬/৬৬/৮-৯)।

⇨ তিনি একাধিক বিয়ে কোরেছিলেন। তন্মধ্যে মামাতো ও ফুফাতো বোনদের মধ্যে ভদ্রা,

মিত্রবিন্দাকে বিয়ে করেছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীদের নাম- রুক্মিনী, কালিন্দী, সত্যা, জাম্ববতী, রোহিনী, লক্ষণা, সত্যভামা, তম্বী ইত্যাদি। এক কথায় তিনি ছিলেন, "মানুষীং যোনি মস্তায় চরিষ্যতি মহিতলে (মহাভারত ৬/৬৬/১০২)। অর্থাৎ এই ধরার বুকে একজন মানুষের মত মানুষ'। তাঁর যুগের আদর্শ মানব, মহামানব।

➪ তিনি ছিলেন সত্য ধর্মের প্রচারক তথা বৈদিক ঋষিদের প্রচারিত ধর্মের বাহক ও প্রচারক যাহা ছিল সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধর্ম এসলাম। সত্য ও সত্যধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন মহাভারত বলছে "নাস্তি সত্যাত পরোধর্ম" সত্যই ধর্ম আর ধর্মই সত্য। আর এই সত্য ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরতেন। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে তিনি যুদ্ধের অনুমতি দিতেন (ভগবৎ পুরাণ ৫/১৫১/৪৫)।

➪ অন্যান্য নবী-রসুলদের ন্যায় তিনিও অযথা রক্তপাত, অন্যায় যুদ্ধ পছন্দ কোরতেন না। ভগবৎ পুরাণ দেখুন তাই বলছে ঃ "সর্বোথা যতমানা নামযুদ্ধ ভিকাংক্ষতাম সান্তে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধং নাপরাক্রমঃ" (ঐ ৫/৭২/৮৯)। তিনি বোলেছেন, এই ধর্মযুদ্ধে নিহত হলে, "হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং স্বর্গলাভ।" অথাৎ- শহীদ ব্যক্তি স্বর্গলাভ করেন (ঐ)।

➪ অন্যান্য নবীদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আপনজন আত্মীয়রাই তাঁর প্রধান শত্রু, বিরোধী ছিলেন। (ভগবৎ ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস পৃ-৩০০) তারা তাঁর উপর নির্যাতন করেন। উল্লেখ্য যে, মথুরার রাজা কংস বা কনিষ্কো যিনি শ্রীকৃষ্ণের আপন আত্মীয়, মামা ছিলেন। তাঁর অত্যাচারের কারণেই বাধ্য হোয়ে তিনি দ্বারকায় 'হেজরত' করেন, যা অনেক নবীর ক্ষেত্রেই সংঘটিত হোয়েছিল।

➪ অনেক ধর্মদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণকে বেদ-বিরোধী মনে করে তাঁর বিরোধিতা কোরেছেন (ঐ ২০০ পৃষ্ঠা)। সত্যিকার অর্থে তিনি ঐশী-গ্রন্থ বেদের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু পূর্ববর্তী বিকৃত বৈদিক ধর্মের পুরোহিতরা বেদ ও বেদের নামে বিকৃত প্রক্ষিপ্ত মনগড়া বাণী প্রচার কোরতো আর তাই তিনি এই বিকৃতধর্ম বাণীর বিরোধিতা কোরতেন।

➪ তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে প্রকৃত মীমাংসা করার জন্য আবির্ভূত হোয়েছিলেন (মহাভারত ১৩/৫৮/৫-৬), যা অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও সত্য। ঐ যুগের অসুর প্রকৃতির (কাফের) মানুষরা সত্য-ধর্মের বিরোধিতা কোরতো এবং অসত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কোরতে তৎপর ছিল। যেমন বলা হোয়েছে, "অসত্রম প্রতিষ্ঠিংতে জগদাহুরানশ্বরম।" অর্থাৎ-সত্যধর্ম ব্যবস্থায় বিশ্বাস বা জগদীশ্বরে বিশ্বাস কোরতো না (গীতা-১৬/৮)।

➪ ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। ধর্ম ছাড়া মানুষ পশুর সমতুল্য। যেমন শাস্ত্রে বলা হোয়েছে, "আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনংচ সামান্য মেতৎ পশু ভিনরানাম। ধর্মেহিতেসা মধিক বিশেষঃ ধর্মে নহীনা পশুভির্সমানাঃ।" অর্থাৎ- ধর্মহীন মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়েই আহার নিদ্রা, ভয় এবং যৌন কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে।"

➪ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সরল জীবন যাপন কোরতেন। আহার-নিদ্রা-বেশ-ভূষায় সাদাসিদা ও পবিত্র ছিলেন। তাঁর যুগের লোকেরা মদ্যপান কোরতো এবং পানাসক্তে এত বিভোর ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ মদ্যপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আদেশ জারি করেন এবং মদ্য প্রস্তুত নিষিদ্ধ করেন (শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবৎ ধর্ম–১৩৫পৃ.)।

➪ মহামানব শ্রীকৃষ্ণ ধর্মীয় রীতি-নীতি শাস্ত্র মতই পালন কোরতেন। প্রতিদিন সকালে 'ব্রহ্ম মুহূর্তে' (ফজরওয়াক্তে) শয্যা ত্যাগ করে হাত-মুখ ধৌত করতঃ (আচমন-ওজু) অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত পরমাত্মাকে (আল্লাহকে) ধ্যান (যেক্‌র, প্রার্থনা, উপাসনা) কোরতেন। ঐ পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম, যিনি স্বয়ং জ্যোতি (নুর), অব্যয়-নিত্য (হাইয়্যুল কাইয়্যুম) ও নিষ্কলঙ্ক (সোবহান)। সন্ধ্যাকালে উপাসনা কোরতেন (বিষ্ণু ভাগবৎ পুরাণ)। তিনি রাত্রের অর্ধযাম বাকী থাকতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হোয়ে সনাতন ব্রহ্মকে (পরম প্রভু) ধ্যান কোরতেন (মহাভারত-১২/৫৩/১-২)। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'ব্রহ্ম' অর্থ- বৃহৎ যা আরবিতে 'আকবর' বলে, মহান আল্লাহ নিজেই সাদৃশ্যহীন "বৃহৎ সত্ত্বা"। আল্লাহ বিরাট বা মহান, যাকে মোসলেমগণ আরবিতে "আল্লাহু আকবর" বোলে থাকেন।

➪ অন্যান্য নবী-রসুলদের মত শ্রীকৃষ্ণও তাঁর সদৃশ রূপবান, বলবান, বীর্যবান, সর্বশাস্ত্র কুশলীরাজ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন এবং অন্যান্য মহৎগুণ সমৃদ্ধ এক পুত্র সন্তানের জন্য প্রভুর দরবারে তপস্যা কোরেছিলেন' (হরিবংশ-৩/৭৩)। উপরের প্রার্থনা হোতে বুঝা যায় যে, সৎ পুত্র কামনা করা প্রেরিত নবী-রসুলদের চিরায়ত রীতি, যা এব্রাহীমও (আ:) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কোরেছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ১০১ মতান্তরে ১০৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন (দেশ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪)।

এমন প্রমাণ আরও বহু দেওয়া যাবে, কিন্তু সত্যান্বেষী মনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট বোলে আমার বিশ্বাস। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হোতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জন্ম-মৃত্যু, ঘর সংসার, পরিবার-পরিজন পরিচালনা, সাধনা-উপাসনা, আদর্শ সমাজ সংস্কার, সত্য-ধর্মের সেবা, প্রয়োজনে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শে বিশ্বাসী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ও সবকিছু মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর যুগের একজন প্রেরিত-পুরুষ, মহামানব পথ-প্রদর্শক, নবী-অবতাররূপেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

চলমান সঙ্কট ও জঙ্গিবাদ নিরসনে যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীবর্গ [সৌজন্যে: দৈনিক দেশেরপত্র]

গত ২৩ মার্চ কুমিল্লায় দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল এম.পি। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'দৈনিক দেশেরপত্র প্রকাশিত লেখা ও বক্তব্যে এসলামে নারী ও পুরুষের অধিকারের যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছে সমাজের সবাই ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হলে ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের সমুচিত জবাব দেয়া সম্ভব হবে। তারা মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে আমাদের রুখতে পারবে না। এজন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে।'

গত ৫ এপ্রিল গাজীপুরে দৈনিক দেশেরপত্রের ব্যুরো অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম.পি। তিনি বলেন, "আজ দেশেরপত্রের যে আদর্শ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরও সেই একই আদর্শ। দৈনিক দেশেরপত্র যদি তাদের এই লক্ষ্য ও আদর্শে অটল থাকে তাহলে আমরা সর্বাবস্থায় তাদের পাশে থাকবো।"

গত ৯ মার্চ, দৈনিক দেশেরপত্রের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক। তিনি বলেন, 'দেশেরপত্রের এই জঙ্গিবাদ ও ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতির বিষয়বস্তুর সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোটি কোটি সমর্থক একমত এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ জনতা একে সর্বাত্মক সাহায্য করবে।' তিনি এ ব্যাপারে দেশেরপত্রকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

চলমান সঙ্কট ও জঙ্গিবাদ নিরসনে যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীবর্গ [সৌজন্যে: দৈনিক দেশেরপত্র]

পাবনায় দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা ব্যুরো কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু। তিনি বলেন, "আজকে আমাদের লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে, ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা বিরোধীদের, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে, মানবতা-বিরোধীদের বিরুদ্ধে। দেশেরপত্র সেই চেতনাকে ধারণ করছে বোলে আমি দেশেরপত্রের সাথে সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্য পোষণ করছি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান পুরো বাঙালি জাতিকে একত্রিত করার মত এই মহান কাজে দেশেরপত্রই হবে আমাদের মুখপত্র।"

গত ৯ এপ্রিল দৈনিক দেশেরপত্রের খুলনা বিভাগীয় ব্যুরো অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এম.পি।

তিনি জঙ্গিবাদ দমন, ধর্মের নামে অপরাজনীতি এবং ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দেশেরপত্রের চলমান কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে দেশেরপত্রের এই কার্যক্রম প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ ও আপামর জনসাধারণকে এ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গত ১১ এপ্রিল নেত্রকোনায় দেশেরপত্রের জেলা কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। তিনি বলেন- "আপনাদের কথায় আমি পুলকিত হোয়েছি, উজ্জীবিত হোয়েছি। আমার শিরা-উপশিরা, ধমনীতে জাগরণ সৃষ্টি হোয়েছে। আপনাদের সকল সেন্টিমেন্ট ও বক্তব্যের সাথে আমি একমত। আমাদের পথচলা একসাথে। আজ আমরা চিহ্নিত কোরতে পেরেছি জাতির মূল সমস্যা কোথায়। এই ধর্মব্যবসায়ী, ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতিকারীরাই জাতির মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হোয়েছে আজ, যা আমরা গত ৪৩ বছরেও বুঝতে পারি নি। আমরা সম্মিলিতভাবে এই সমস্যাকে মোকাবেলা কোরতে চাই।"

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে সর্বধর্মীয় সম্মেলন

সিলেট জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-এর একাত্মতা প্রকাশ

গত ১২ জুলাই সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দৈনিক দেশেরপত্রের উদ্যোগে স্থানীয় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ও সুধীসমাজকে নিয়ে 'এক জাতি এক দেশ, ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দেশেরপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি আজমল হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো: শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ.এফ. রুহুল আনাম চৌধুরী (মিন্টু), সিলেট বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের, সিলেট প্রেসবিটারিয়ান চার্চ এর এর সহকারী পুরোহিত ডিকন নিখুম সাংমা, ক্যাথোলিক ধর্ম যাজক, খাদিম মিশনের ফাদার হেনরি রিবেরু, সিলেট মহানগর সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুস সহিদ খান, দেশেরপত্রের সাহিত্য সম্পাদক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রিয়াদুল হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই মানবজাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দেশেরপত্রের দেশজুড়ে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর "সনাতন ধর্ম" শিরোনামে অপর একটি প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়। পরবর্তীতে দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী এবং পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট মো: রিয়াদুল হাসান তাদের স্ব স্ব বক্তব্যে সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে ধর্মের মূল শিক্ষা, সনাতন শিক্ষার উপরে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং মাননীয় এমামুয্যামানের শিক্ষা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ধর্মগুরুরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দেশেরপত্রের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী বলে সমন্তব্য করেন। ধর্মীয় বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদ, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ইত্যাদি থেকে মুক্তি হয়ে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিতে বসবাস করার জন্য দৈনিক দেশেরপত্রের এই কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

সিলেট বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের দৈনিক দেশেরপত্র কর্তৃক উত্থাপিত মানবজাতিকে

মঞ্চে উপবিষ্ট (সর্ব ডান থেকে) সিলেট প্রেসবিটারিয়ান চার্চ এর সহকারী পুরোহিত ডিকন নিখুম সাংমা; ক্যাথলিক ধর্ম যাজক, খাদিম মিশন, বিশপ হাউস সিলেট এর ফাদার হেনরী রিবেরু; দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী; সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ.এফ.রুহুল আনাম চৌধুরী (মিন্টু); সিলেটের জেলা প্রশাসক মো: শহিদুল ইসলাম; দৈনিক দেশেরপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি আজমল হোসাইন; সিলেট বৌদ্ধবিহার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের এবং সিলেট মহানগর সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুস সহিদ খান

গত ১২ জুলাই সুনামগঞ্জ শহীদ জগৎজ্যোতী পাঠাগারে (পাবলিক লাইব্রেরি) সনাতন ধর্মবলম্বীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) দৈনিক দেশেরপত্রের সাবএডিটর শেখ মনিরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি এইচ এম পি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ধূর্যটি কুমার বসু, অনুষ্ঠানের সভাপতি দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা প্রতিনিধি মো: মোতালিব খান, বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড সুরেশ চন্দ্র দাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেলা আ'লীগ, সুনামগঞ্জ ও সাবেক সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি সুনামগঞ্জ, অ্যাড স্বপন কুমার দেব, সিনিয়র আইনজীবী, সুনামগঞ্জ এবং যোগেশ্বর দাশ, সহকারী প্রধান শিক্ষক (অব:) বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়।

ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের চারপাশে আমরা দেখছি বিশাল বিশাল প্রাচীর। এসব কিসের প্রাচীর? এগুলো হল বিরোধের প্রাচীর আর বিদ্বেষের প্রাচীর। কারা এই প্রাচীরগুলি নির্মাণ করেছেন? এই আমরাই যারা বিভিন্ন ধর্মের ধ্বজা ধারণ কোরে আছি এবং পৌরহিত্য করছি তারাই নিজেদের স্বার্থে এই প্রাচীরগুলি নির্মাণ করেছি এবং সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে রেখেছি। এর ফলে ধর্মের নাম নিয়ে বহু সহিংস ঘটনা ঘটছে এবং মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এসলাম শব্দের অর্থই শান্তি, অথচ প্রায়ই এসলামের সঙ্গে টেররিজম শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়।' মায়ানমার ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যে ধর্মের প্রবেশদ্বারই হচ্ছে অহিংসা তারা কিভাবে মায়ানমারে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করছে, তাও ধর্মের নামে। যারা এমন করছে তারা নিশ্চয়ই বুদ্ধের অনুসারী নয়।' **সিলেটের খাদিম মিশনের ক্যাথেলিক ধর্মযাযক ফাদার হেনরি রিবেরু** 'একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ' শ্লোগানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, 'অনেক দেরিতে হলেও একটা মোক্ষম সময়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এটা যদি আরও অনেক আগে হত আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম। ঈশ্বর বলেছেন আমি সেই তিনি, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। বাইবেলে বর্ণিত আদমের দুই সন্তানের মধ্যে এক ভাই ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, তাকে আরেক ভাই হিংসা করে হত্যা করে ফেলেন। সেই থেকে মানবজাতির মধ্যে সংঘাত শুরু। কিন্তু আজ এই সংঘাত প্রকট ও অসহনীয় রূপ ধারণ করেছে। এ থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে চিন্তা করতে হবে। দেশেরপত্রের এই উদ্যোগে, তাদের একজাতি হওয়ার আহ্বান সম্বলিত লিফলেটখানা পড়ে আমি প্রচণ্ডভাবে উজ্জীবিত হয়েছি।'

গত ১১ জুলাই রাজধানীর স্বামীবাগে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দিরে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উক্ত মন্দিরের সভাপতি অনিল কুমার মুখার্জী ও সেক্রেটারি বিষ্ণু পদ ভৌমিকসহ স্থানীয় সনাতনধর্মাবলম্বী অনেকে। উক্ত আলেচনা সভায় মাননীয় এমামুয্যামানের অনুসারী ফরিদ উদ্দিন রব্বানীসহ উপস্থিত ছিলেন আবুল হাসেম, মো: জিল্লুল শাহিন ও আবদুর রশিদ।

রাজশাহী বিভাগ

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি পাবনা জেলার অষ্টমণিষা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি শ্রী ক্ষিতীষ চন্দ্র শীল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে হেযবুত তওহীদের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে যামানার এমামের অনুসারী শামসুযযামান মিলনকে (বামে) আর্শিবাদ কোরছেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সদরঘাট থানাধীন স্ট্যান্ডরোড মাইজপাড়ার শ্রী শ্রী শনি ঠাকুর মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু লক্ষণ দাস, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাবু শ্রী রতন দাস-সহ উপস্থিত ছিলে বাবু চন্দ্র, মোহন দাস সর্দার এবং যামানার এমামের অনুসারী সাহেদুল এসলাম হিরো ও নুর এসলাম খোকন প্রমুখ

গত ১২ জুলাই খুলনা ছোটবয়রা কালীবাড়ি সার্বজনীন পূজা মণ্ডবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্দিরের সভাপতি বিজয় কৃষ্ণপাল, সাধারণ সম্পাদক নিতাই সরদার, দিলয় মুখার্জী, হেমচন্দ্র দাশ,বাসুদেব সাহা, অশোক বিশ্বাস, সিবুপদ মন্ডল, জয়দেব বাসক ও দেশেরপত্রের খুলনা ব্যুরো প্রধান ডাঃ মাকসুদে মাওলা, হাসানুর রহমান রনি ও মুশফিকুর রহমান শামীম।

গত ১২ জুলাই বরিশাল সিটি-কর্পোরেশনের ২৫নং ওয়ার্ডের হরি ঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রী দুলাল চন্দ্র কর্মকার, যামানার এমামের অনুসারী মোঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ রুহুল আমীন, এ কে আজাদ প্রমুখ

মহাভারতের কথা

পারিবারিক শান্তিরক্ষায় নারীর ভূমিকা

কোকিলানাং স্বররূপং, স্ত্রীনাং রূপং পতিব্রতম,
পুরুষাণাং বিদ্যারূপং, তপস্বীনাং ক্ষমারূপং।
ভাবার্থ: কোকিলের রূপ তার কণ্ঠস্বরে হয়, পতিভক্তি হোল নারীর রূপের পরিচয়,
পুরুষের রূপ তার বিদ্যাগুণে হয়, ক্ষমাগুণে তপস্বী চিরকান্তিময়।

সুপ্রাচীন এই সংস্কৃত প্রবচনটিতে আমরা জানতে পারি একটি নিগুড় সত্য যা নিয়ে বিভ্রান্তি ও বিতর্কের কোন শেষ নেই। বিতর্কটি হোচ্ছে মানুষের রূপের মানদণ্ড কি? মানুষের প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তার চারিত্রিক গুণাবলীতে, চেহারায় নয়। নারীর রূপের মানদণ্ড হোচ্ছে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও ভক্তি। এটা নিত্যসত্য, এর অস্বীকার পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলাকে একেবারে বিধ্বস্ত কোরে দিতে পারে।

মানুষের জন্য সবচেয়ে নির্মল, শান্তিদায়ী, চিত্ত-প্রশান্তিকর, ক্লান্তি নিবারক, স্বস্তির আশ্রয় তার পরিবার। কারণ নিজ পরিবারে একজন মানুষ যেমন নিখাদ ভালোবাসা লাভ করে তার তুলনা আর কোথাও নেই। পারিবারিক শান্তিবিধানে পুরুষ ও নারী উভয়ের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রোয়েছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি যুগে যুগে আল্লাহ নবী রসুল অবতারদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন, যার ফলে পারিবারিক জীবনের একটি ব্যবস্থা, সংস্কৃতি আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম মানুষের নৈতিক চরিত্র তৈরি করে, মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু কোরে জীবনের সর্ব অঙ্গনের বিধান দেয়। আজকে পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল ধর্মের অনুসারীরাই তাদের জীবন-বিধাতা হিসাবে দাজ্জালকে গ্রহণ কোরে নিয়েছে, সুতরাং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, জাতীয়, সামষ্টিক জীবনের ক্ষেত্রসমূহ পরিচালিত হোচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা দাজ্জালের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, রোমান দণ্ডবিধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি মতবাদের দ্বারা। লক্ষণীয় যে, পশ্চিমা সভ্যতার কোন জীবনব্যবস্থাতেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবন সুখময়, শান্তিময় করার পথ দেখায় না। পাশ্চাত্যের কোন মতবাদে বলা নেই যে, বাবা-মাকে সেবা কোরতে হবে, বড় ভাইকে পিতার মত জানতে হবে, ওয়াদা দিলে রক্ষা কোরতে হবে, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান কোরতে হবে, কিভাবে মানুষ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘোটিয়ে মানুষ হিসাবে মহান হবে ইত্যাদি। ধর্মকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে চরম আত্মিক শূন্যতা, নৈতিকতাহীনতা সৃষ্টি হোয়েছে, বিশেষ কোরে ধর্ম থেকে আগত যে নৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিগুলি আমাদের ব্যক্তি

অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করেন কিন্তু তখন আর বিয়ে হয় নি। পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী পাণ্ডবদের গৃহে প্রবেশ কোরবেন তখন তাঁরা তাঁদের মা কুন্তীকে চিৎকার করে ডেকে বলছিলেন, 'মা, দেখে যাও কী এনেছি!' তাঁর মা কিছু না দেখেই ঘর থেকে উত্তর করে, 'যাই আনিস না কেন পাঁচ ভাইয়ে ভাগ কোরে নে'। মায়ের আদেশ রক্ষার্থেই পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন।

ও পারিবারিক জীবনকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে ধোরে রেখেছিল, সেই শৃঙ্খলার বাঁধন, বিশেষ কোরে আত্মিক বাঁধন ঢিলে হোয়ে গেছে, বহু স্থানে কেবল ঢিলেই হয় নি, একেবারে নিশ্চিহ্নও হোয়ে গেছে। পশ্চিমা দেশগুলিতে অধিকাংশই বিয়েই স্থায়ী হয় না, যতদিন বিয়ে থাকে বনিবনা থাকে না, অশান্তি চোলতে থাকে। যে বাবা মা সন্তানদেরকে অসীম মায়া মমতায় তিলে তিলে বড় কোরে তোলে, সেই বাবা মাকে বৃদ্ধ বয়সে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃদ্ধাশ্রমে। সমাজের প্রতিটি নারী পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত, ব্যভিচার কোন অপরাধ হিসাবেই গণ্য হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এভাবেই গ্রাস কোরে নিয়েছে মানুষের সকল মনুষ্যত্ব। দাজ্জাল শিখিয়েছে- ধর্ম নারীর অধিকারকে খর্ব করে, নারীকে বন্দী করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে নারীদেরকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে, এভাবে সে নারী-পুরুষের মধ্যে একটি স্নায়ুযুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে, এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজের অধিকাংশ 'আধুনিক' পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নেই কোন শ্রদ্ধাবোধ। তারা কে কার উপরে কর্তৃত্ব কোরবে তা নিয়ে চরম দ্বিধাগ্রস্ত, একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের কলহে লিপ্ত, ফলে পারিবারিক ও জাতীয় শান্তি এখন কেবলই স্বপ্ন।

মহাভারতের মহিয়সী নারী মাতা দ্রৌপদী

বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে থেকে যদি আমরা আমাদের সুদূর অতীতের পারিবারিক জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরি, সেখানে যা দেখবো তা আমাদের বোধগম্য বা বিশ্বাসযোগ্য নাও হোতে পারে। কারণ সেই ইতিহাস বর্তমানের ধ্যান ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল এবং পদে পদে সাংঘর্ষিক। সত্যযুগের কথা নয়, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগের ভারতবর্ষ। পাণ্ডবরাজ্যে চোলছে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের শাসন, অর্থাৎ আল্লাহর আইনের শাসন। আরেকটু এগিয়ে বোলতে গেলে- এসলামের শাসন। শান্তিময় মহাভারত। পঞ্চপাণ্ডব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির (আ:), অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব - এই পাঁচ ভাইয়ের এক স্ত্রী মহারাণী দ্রৌপদী। শ্রীকৃষ্ণের (আ:) স্ত্রী সত্যভামা এসেছেন দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে।

বহুদিন পরে একে অপরের সাক্ষাৎ লাভ কোরে এই দুই মিষ্টভাষী নারী পরমানন্দে একত্রে বোসে কুরু ও যদুবংশ-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন কোরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা দ্রৌপদীকে বোললেন, "দ্রৌপদী! তুমি রাজার ন্যায় সুদৃঢ়-কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সাথে কিরূপ ব্যবহার কোরে থাক? দেরা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হন না, বরং তারা এমনই বশীভূত হোয়েছেন যে, তোমায় ছাড়া আর কাউকেও মনে করেন না, এর কারণ কি? সোম-বারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদিরূপ তপ, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণবিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি, জপ, হোম, বা অঞ্জনাদি ঔষধ, এর কোন উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এমন বশীভূত হোয়েছেন? হে দ্রৌপদী! এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন সৌভাগ্যজনক উপায় বল, যা দ্বারা আমি কৃষ্ণকে সবসময় বশীভূত কোরে রাখতে পারি।"

সত্যভামা এই কথা বোলে থামলে পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁকে বোললেন, "হে সত্যভামা! তুমি যে সকল আচরণের কথা উল্লেখ কোরলে, অসৎ স্ত্রীগণই ঐ সকল আচারণ কোরে থাকে; আমি কিভাবে তার উত্তর দেই? তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ কৃষ্ণের স্ত্রী, এ জাতীয় বিষয়ে প্রশ্ন করাও তোমার উচিত নয়। দেখ, স্বামী স্ত্রীকে মন্ত্রপরায়ণ (মন্ত্র, তাবিজ-কবজ দিয়ে স্বামীকে বশীকরণ কোরতে সচেষ্ট) জানতে পারলে ঘরে সাপ থাকলে মানুষ যেমন সদা উদ্বিগ্ন থাকে, তেমনিভাবে উদ্বিগ্ন থাকে। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই, অশান্ত লোক কখনই সুখলাভ কোরতে সমর্থ হয় না। হে ভদ্রে (উচ্চ-সমাজভুক্ত সভ্য নারী)! স্বামী কখনোই মন্ত্রদ্বারা বশীভূত হন না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা শত্রুর রোগোৎপাদন বা তাকে বিষ প্রদান কোরে থাকে। লোকে জিহ্বা বা ত্বক দ্বারা যে-সমস্ত বস্তু সেবন করে, সেগুলিতে চূর্ণবিশেষ মিশ্রিত কোরে প্রদান কোরলে অবশ্যই প্রাণসংহার হয়। অনেক পাপী নারী স্বামীদেরকে বশ কোরবার জন্য ঔষধ প্রদান করায় তাদের মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্ত (পেটফোলা), কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত (চুল পাকা), কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড় (বুদ্ধিহীন), কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হোয়ে গিয়েছে। হে বরবর্ণিনি (সর্বগুণান্বিতা রমণী)! নারীদের কখনও স্বামীর অপ্রিয় আচরণ কর্তব্য নয়।

"হে সত্যভামা! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের (পাঁচ স্বামীর) প্রতি যেরূপ ব্যবহার কোরে থাকি, তা বোলছি শোন। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার কোরে সবসময় পাণ্ডবগণ ও তাঁদের অন্যান্য স্ত্রীদের পরিচর্যা কোরে থাকি। অভিমান পরিহার কোরে প্রণয় প্রকাশ কোরে অনন্যমনে (একাগ্রচিত্তে) স্বামীদের চিত্তানুবর্তন (মনের অনুসরণ) করি। কখনও তাঁদের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ ও কঠোর দৃষ্টিপাত না কোরে ফেলি সেজন্য সদা শঙ্কিত থাকি, কখনও দ্রুত পা ফেলে মন্দরূপে হাঁটি না বা কুৎসিতরূপে বোসি না এবং সেই সূর্যের সমান তেজস্বী শত্রুধ্বংসকারী শ্রেষ্ঠবীর পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ (যে ইঙ্গিত বুঝতে সমর্থ) হোয়ে সর্বদা সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব, কি পরমসুন্দর অলংকৃত যুবক, কাউকেও মনে স্থান প্রদান কোরি না, স্বামীগণ স্নান, ভোজন ও বিশ্রাম না কোরলে কখনও আহার বা উপবেশন কোরি না। স্বামী কর্মক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হোতে ঘরে ফিরলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁদের আসন প্রদান ও পানি পান কোরিয়ে তাঁদের অভিনন্দন করি।

"আমি প্রতিদিন উত্তমরূপে গৃহপরিষ্কার, গৃহের সব উপকরণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, রান্না করা, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য (খাদ্যশস্য) রক্ষা কোরে থাকি। দুষ্ট নারীদের সঙ্গে কখনই মিলিত হোই

না; তিরস্কারবাক্য (বকা-ঝকা) মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হোয়ে কালযাপন করি। পরিহাসের সময় ব্যতীত হাসি তামাশা এবং বাড়ির দুয়ারে বা অপরিচ্ছন্ন স্থানে কিংবা বাগানে গিয়ে সময় কাটাই না। অতিরিক্ত হাসি বা অতিরিক্ত রাগ বর্জন কোরে সত্যে নিয়ত হোয়ে সর্বদা স্বামীগণের সেবা কোরে থকি; তাঁদেরকে না দেখে একমুহূর্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের জন্য দূরে কোথাও গেলে পুষ্প ও অনুলেপন (সুগন্ধি) পরিত্যাগপূর্বক ব্রতানুষ্ঠান (স্বামীদের জন্য প্রার্থনা-অনুষ্ঠান) করি। স্বামী যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করি। ধর্মীয় বিধিমোতাবেক অলংকৃত ও প্রযত্ন (সর্বাত্মক চেষ্টা) হোয়ে স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কোরে থাকি।

"আমার শ্বশুর আত্মীয়-পরিজনের বিষয়ে আমাকে যে-সমুদয় ধর্মোপদেশ প্রদান কোরেছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম আমার মনে জাগরুক আছে, আমি কোনকিছু না ভুলে দিবারাত্র সেগুলি পালন করি। আমি অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে সর্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্মপালক স্বামীদেরকে ক্রুদ্ধ সাপের মত মনে কোরে পরিচর্যা কোরে থাকি।

হে ভদ্রে! আমার মতে স্বামীকে আশ্রয় কোরে থাকাই স্ত্রীদের সনাতন ধর্ম। স্বামীই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি; এজন্য স্বামীদের বিপ্রিয়ানুষ্ঠান (অপ্রিয় কাজ) করা নিতান্ত গর্হিত অপরাধ। আমি স্বামীদের আগে শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান কোরি না এবং প্রাণ গেলেও শ্বশুরের নিন্দা কোরি না। হে শুভে (ভালো মেয়ে)! আমরা সার্বক্ষণিক সাবধানতা, কার্যদক্ষতা ও গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষা করা দেখে স্বামীগণ আমার বশীভূত হোয়েছেন।

"হে সত্যভামা! আমি প্রতিদিন বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে (দ্রৌপদীর শ্বাশুড়ি) স্বয়ং খাদ্য ও পানাহার করাই, তাঁকে পোশাক পরিয়ে দেই। এভাবে তাঁর সেবা কোরি। আমি কখনও তাঁর অপেক্ষা ভালো খাদ্য খাই না, তাঁর চেয়ে উত্তম পোশাক ও অলঙ্কার পরি না। আগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রতিদিন আট হাজার ব্রাহ্মণ মূল্যবান পাথরের পাত্রে ভোজন কোরতেন এবং যাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনশত কর্মচারী পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, এমন অষ্টাশি হাজার গৃহমেধী স্নাতক (গৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত জ্ঞানী পণ্ডিত) প্রতিদিন প্রতিপালিত হোতেন। অপর দশসহস্র স্নাতকের জন্য প্রতিদিন স্বর্ণপাত্রগুলি সুচারুরূপে পরিবেশিত খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকত। আমি ঐ সকল ব্রাহ্মণগণকে অন্নপান ও পোশাক-আশাক দিয়ে যথাযথভাবে আপ্যায়ন কোরতাম।

"মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নাচ ও গানে পারদর্শী শতসহস্র দাসী ছিল; তারা মহামূল্যবান মালা ও চন্দনে সুসজ্জিত এবং সর্বদা বলয় (চুড়ি), কেয়ূর (বাজুবন্ধ), নিষ্ক (সোনা) ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হোয়ে থাকত। আমি তাদের সকলেরই নাম, রূপ ও তারা যে যেই কাজ কোরত তার সবকিছু জানতাম এবং তাঁদেরকে অন্ন, পান ও থাকার বন্দোবস্ত কোরতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হাতে নিয়ে দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাত। ইন্দ্রপ্রস্থে (পাণ্ডবদের নিজস্ব রাজধানী) বাসকালে এক লক্ষ অশ্ব ও দশ-অযুত হাতী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিল।

"মহারাজ ধর্মরাজের (যুধিষ্ঠির) রাজ্যশাসনকালে এই সমস্ত বিষয় ছিল, আমি সেই সকল হাতি-ঘোড়া, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, এই পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান কোরতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয়ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ কোরে ধর্মানুষ্ঠানে মগ্ন হোতেন, আমি সকল সুখ পরিহার কোরে দিনরাত সেই দুর্বহ ভার বহন কোরতাম। আমি একাকিনী জলনিধির (সমুদ্র) ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান কোরতাম; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাকে সহচরী কোরে সতত পাণ্ডবগণের আরাধনা কোরতাম। আমি সর্বাগ্রে ঘুম থেকে উঠতাম ও সবার পরে শুতে যেতাম এবং সতত সত্য-ব্যবহারে (ন্যায় আচরণ) রত থাকতাম। হে সত্যভামা! আমি স্বামীদেরকে বশীভূত কোরবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসৎ নারীদের মত কখনও খারাপ ব্যবহার কোরি না, তা কোরতে ইচ্ছাও কোরি না।"

সত্যভামা ধর্মচারিণী পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীর কথা শুনে তাঁকে বোললেন, "হে যাজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হোয়েছে, ক্ষমা কর; সখীজনের পরিহাসবাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এমন হোয়ে থাকে, তাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নয়।"

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

দ্রৌপদী বোললেন, "সখি! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ কোরবার যে অব্যর্থ উপায় বোলছি সে অনুযায়ী কাজ কোরলে তোমার স্বামী আর কখনও অন্য নারীর দিকে তাকাবেন না। পতিই পরমদেবতা; পতির ন্যায় দেবতা আর কোথাও দেখা যায় না; অতএব তাঁর প্রসাদে (প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টি) সমস্ত মনের ইচ্ছা সফল হয়, রাগ ও অসন্তুষ্টি চোলে যায়, তাঁহা হইতেই অপত্য (সন্তান), বিষয়-আশয়, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্তি লাভ হোয়ে থাকে। সুখের সময় সুখলাভ হয় না, সাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ কোরে পরিশেষে সুখলাভ করে।

"তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয়প্রকাশ কোরে রমণীয় বেশভূষা, ভালো ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধ-মাল্য প্রদানদ্বারা তাঁর আরাধনা কোরলে তিনি নিজেকে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা কোরে অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘরের দরজায় স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করামাত্র উঠে গিয়ে ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কোরবে, এরপর তিনি ঘরে প্রবেশ কোরলেই পা ধোয়ার পানি ও আসন প্রদান কোরে তাঁর অভ্যর্থনা

কোরবে। তিনি কোন কাজের জন্য দাসীকে নিয়োগ কোরলে তুমি স্বয়ং উঠে গিয়ে সেই কাজটি কোরে ফেলবে। তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই অতি স্বামীভক্ত বোলে জানবেন। স্বামী তোমার কাছে যেসব কথা বোলবেন তা গোপনীয় না হোলেও তুমি কখনও সেগুলি প্রকাশ কোরবে না, কারণ তোমার স্বপত্নী (স্বামীর অপর স্ত্রীগণ) যদি কখনও সেই কথা কৃষ্ণকে বলেন, তা হোলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হোতে পারেন।

"যে-সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রিয়জন, যারা স্বামীর শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমার স্বামীর যারা উপকারী বন্ধু বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে ভোজন করাবে এবং প্রযত্ন (অত্যন্ত অধ্যবসায়) সহকারে স্বামীকে অসৎসঙ্গ ও কুমন্ত্রণাদাতা নারী ও পুরুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করাবে। অন্য পুরুষের সামনে মত্ততা (রাগ, ক্ষোভ, ক্ষিপ্ততা ইত্যাদি আবেগ) ও অসাবধানতা (অমনোযোগিতা) পরিত্যাগ কোরে নীরবতা অবলম্বন কোরে স্বীয় অভিপ্রায় গোপন রাখবে।

"সৎবংশীয় পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরবে; নিষ্ঠুর, হিংস্র, খল, ঝগড়াটে, ভোজনপ্রিয়, চোর, দুষ্ট ও চপল নারীদের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কোরবে এবং সুগন্ধীদ্রব্য, সুগন্ধী তেল ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত থেকে ও ফুলের মালা পরে স্বামীর সেবা কোরবে। এইভাবে সদাচরণের দ্বারা স্বামীর কালহরণ কোরলেও কেউ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ কোরতে পারবে না এবং তোমার মহতী কীর্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হবে।"

মাতা দ্রৌপদী ও আম্মা খাদিজা (রা.)

আম্মা খাদিজা (রা:) আখেরী নবী অর্থাৎ কল্কী অবতারের স্ত্রী। তাঁকে যদি উম্মুল মো'মেনীন বা মোমেনদের মা বোলে শ্রদ্ধা করা হয় তবে আল্লাহর আরেক অবতার যুধিষ্ঠিরের (আ:) স্ত্রী দ্রৌপদীকে মা দ্রৌপদী বোলতে বাধা কোথায়? বরং সেটা কোরলেই দ্রৌপদীর প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয়। তা না কোরে দ্রৌপদীর বিষয়ে তীর্যক ও কটুবাক্য বোলতেই অনেকে সুখবোধ করেন। সাংসারিক কাজ থেকে শুরু কোরে জাতির প্রয়োজনে মা দ্রৌপদী কী অমানুষিক পরিশ্রম কোরে তাঁর পাণ্ডবদের সংগ্রামী জীবনে নীরবে ভূমিকা রেখে গেছেন তার চিত্র আমরা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ কোরেছি, যেন আমাদের সমাজের নারীরা তাদের নারীজন্ম স্বার্থক করার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল আদর্শ লাভ কোরতে পারে। পাশাপাশি আম্মা খাদিজাও (রা:) কিভাবে নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে একটি মহাবিপ্লবকে সন্তানের যত্নে বড় কোরে তুললেন, কিভাবে রসুলাল্লাহর সঙ্গে থেকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিপ্লবের সৃষ্টি কোরলেন- সেটাও আমরা লিখছি। আমরা তাঁদেরকে কেবল মা ডেকেই সম্মানিত কোরতে চাই না, আমরা চাই তাঁদের যোগ্য সন্তান হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ ■

শাসকই পারেন সত্যযুগ ফিরিয়ে আনতে

সাইফুর রহমান

[মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির (আ:) তাঁর পিতামহ ভীষ্মের কাছ থেকে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি শিক্ষা কোরছিলেন। মহামূল্যবান সেই উপদেশগুলির অধিকাংশই নিত্য সত্য যেগুলি সর্বযুগে, সর্বকালে অপরিবর্তনীয়। এমনই একটি শিক্ষা আমরা সরাসরি কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃত মহাভারতের পাতা থেকে তুলে ধোরছি।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"
ভীষ্ম কহিলেন,"ধর্ম্মরাজ! সর্ব্ব প্রথমে রাজ্যমধ্যে রাজাকে অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরস্পর পরস্পরের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব উদয়োন্মুখ হইবার বাসনা করিলে নরপতিকে ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, ঐ বলবান্ ব্যক্তি প্রজাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গলসম্পাদন করিতে পারেন। আর যদি প্রজারা উঁহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। অতএব সেরূপ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য

ফুলে-ফলে শোভাময় সত্যযুগের কল্পিত চিত্র

কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীকে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশভোগ করে, আর যাহাকে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করে না। যে স্বয়ং প্রণত হয়, তাহাকে তাপিত এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহাকে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবান্ ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত। বলীয়ান্ ব্যক্তিকে প্রণাম করিলেই ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

"মঙ্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে একজনকে নরপতিপদে অভিষেক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধর্ম্ম-উপভোগ করিতে পারে না। ঐ সময় পাপাত্মারা অন্যের ধন অপহরণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হয়, কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার ধন হরণ করে, তখন সে রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে; অতএব অরাজকতা পাপাত্মাদিগেরও সুখজনক নহে। ঐ সময় দু'জন পাপাত্মা একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুইজনের ধন অপহরণ করে। বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সকল দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্তই দেবতারা রাজ্যমধ্যে নরপতির আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীমধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন, তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যসমুদয়কে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।"

সারকথা:

মাঝিবিহীন নৌকা যেমন দিকহীনভাবে ধাবিত হয় তেমনি নেতাহীন জনগোষ্ঠীর জীবনেও কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না, তারাও অনিশ্চয়তার পথেই ধাবিত হয়। রাজাহীন রাজ্যে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। এজন্য মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য হোল একজন নেতৃত্বের অধীনে থাকা, নেতৃত্বহীনভাবে এক মুহূর্তও থাকা অনুচিত। একটি জাতি যখন নেতাহীন তখন যদি কোন শক্তিমান ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সেই জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বভার গ্রহণ কোরতে এগিয়ে আসে, জনগণের উচিৎ তাকে সাদরে বরণ কোরে নেওয়া এবং তাকে সর্ব উপায়ে সহযোগিতা করা, যেন ঐ শক্তিমান ব্যক্তি জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত কোরতে পারেন। অরাজক রাজ্যের লক্ষণ হোল, সেখানে মানুষের জান, মাল ও সম্মানের কোন নিরাপত্তা থাকে না, কোথাও ন্যায়বিচার থাকে না। আজ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসহ সমগ্র পৃথিবী শুধু অরাজকই নয়, উপনিবেশবাদী পশ্চিমা আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলির দস্যুবৃত্তির শিকার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জায়গা দখল কোরেছে অজস্র বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, আইসিটি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যারা সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের চেয়েও বহুগুণ বেশি শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। মহাভারতে বর্ণিত এই শিক্ষা আজ এই মহাগ্রন্থধারী ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কোরতে হবে। যদি কালের আবর্তে কোন বলবান (সত্যনিষ্ঠ) ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের কর্ণধার হোতে আগ্রহী হয় তবে তাদেরকে বাধা প্রদান না কোরে অভিষিক্ত করাই তাদের শাস্ত্রের নির্দেশ। উল্লেখ্য, মহাভারতের আলোচ্য অংশে বলবান ব্যক্তি বোলতে কেবলমাত্র লোকবল, বাহুবল, অর্থবল ও সামরিক বলে বলীয়ান বোঝানো হয় নি। তিনিই প্রকৃত বলবান যিনি সত্যনিষ্ঠ আর সর্বশক্তিমান স্রষ্টার বলে বলীয়ান। সত্যবিমুখ, স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কহীন বলবান ব্যক্তির বল তামসিক শক্তির আধার, তাকে উপাখ্যানের শুরুতেই দস্যু বোলে আখ্যায়িত করা হোয়েছে।

যামানার এমামের অনুসারীরা সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর কোরে মানবজাতিকে এক পরিবারে পরিণত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে যাচ্ছেন। রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পশ্চিম সুন্দর ঠুটাপাইকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন দৈনিক বজ্রশক্তির সহ-সম্পাদক মোঃ আশেক মাহমুদ।

অসম্মান এবং সম্মানের আতিশয্য

আশেক মাহমুদ

আজকে এই ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লারা গায়ে জোব্বা আলখাল্লা, দাড়ি, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি ধারণ করে নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হোয়ে ধর্মভীরু জনসাধারণের সামনে পীর-দরবেশ, বুজুর্গানে দীন সেজে মূর্তির মত পূজা, সম্মান আর সম্মানী নিচ্ছেন। ঠিক তেমনি সনাতন ধর্মের ধারকবাহকরা যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র মহাবীর (আ:) সকলের শিক্ষা ত্যাগ করে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা কোরছে। ঈসা (আ:) এবং মা মরিয়মের উপরে ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীরা যে কলঙ্ক আরোপ কোরেছিল তা আল্লাহ অপনোদন কোরেছেন শেষ নবী এবং পবিত্র কোর'আনের মাধ্যমে। ইহুদিরা ঈসা (আ:)-কে ভ্রষ্টা মরিয়মের অবৈধ সন্তান (নাউযুবিল্লাহ) বোলে প্রচার কোরেছিল। আর খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে ঈসাকে (আ:) ক্রুশবিদ্ধ কোরে নিহত করা হোয়েছে। এসব অপবাদ ও মিথ্যাপ্রচারের আড়াল থেকে আল্লাহ প্রকৃত সত্যকে উদ্ভাসিত কোরলেন যে, মা মরিয়ম আল্লাহর হুকুমে সন্তান ধারণ কোরেছেন এবং তিনি পুতঃপবিত্র ছিলেন। ঈসা (আ:) ছিলেন আদমসদৃশ ও নিষ্পাপ, তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয় নি। এই মহাসত্য আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে প্রকাশ কোরলেও অধিকাংশ মানুষ আজও অপপ্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত। একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ (আ:) এর ব্যাপারেও নারী-সংক্রান্ত বহু কলঙ্ক লেপন করা হোয়েছে, তাঁকে নিয়ে এত গান, কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্র, কীর্তন, পদাবলী, প্রবাদ-প্রবচন ও মুখরোচক রটনা প্রচার করা হোয়েছে যে এসবের আড়াল থেকে প্রকৃত কৃষ্ণকে (আ:) আবিষ্কার করা সত্যিই দুরূহ। তবে আমরা বিশ্বাস কোরি যে, কৃষ্ণের (আ:) পুতঃ চরিত্রে প্রকৃতপক্ষে অপবাদ আরোপ ও কলঙ্ক লেপন করা হোয়েছে, এর পেছনে কারণ যাই থাক, তা ভক্তিবশেই হোক বা চক্রান্তবশেই হোক। এসলাম ধর্মের ইতিহাস হোল মাত্র ১৪০০ বছরের, আর বৈদিক ধর্মের ইতিহাস হাজার হাজার বছর প্রাচীন, তাই তথ্য-বিকৃতির সুযোগও পাওয়া গেছে অনেক বেশি।

নবীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের পথ তাদেরকে পূজা করা নয় কেবল, তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করা। দু' হাজার বছর ধোরে ঈসাকে (আ:) শান্তির যুবরাজ বোলে প্রচার করা হোচ্ছে। তাঁর অনুসারীরা ভক্তির আতিশয্যে তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর' বানিয়ে ফেলেছে। অপরদিকে ইহুদিরা তাকে যারজ সন্তান বোলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। কিন্তু এই যে ভক্তি আর অভক্তির বাড়াবাড়ি- এসব কোরে মানবজাতির কি উপকার হোয়েছে সেটা কি কেউ বোলবেন? শান্তির যুবরাজের অনুসারী দাবিদার খ্রিস্টানরা তাঁর আনীত সকল শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গত দুই হাজার বছর বিশ্বের বুকে মানুষের রক্তে হোলি খেলে চোলেছে। তারাই ধর্মের দোহাই দিয়ে ইউরোপ জুড়ে ইহুদিদের উপর গণহত্যা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা কোরেছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ চালিয়ে বিশ্বের বহু সভ্যতাকে ধূলিস্মাৎ কোরে সেখানকার সম্পদ লুটে পুটে খেয়েছে, কোটি কোটি আদম সন্তান হত্যা কোরেছে। গত শতাব্দীতে তারা দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ঘোটিয়ে ১৪ কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে, আহত-উদ্বাস্তুর কোনো হিসাব নেই। এই শতাব্দীর প্রথম পাঁচ বছরেই তারা দশ লাখ মানুষ হত্যা কোরেছে ইরাক আর আফগানিস্তানে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের নামে এমন এক নিষ্পেষণমূলক পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা মানবজাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে যে সমগ্র মানবজাতি অন্যায়-অবিচারের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং যিশু মানুষ না আল্লাহর পুত্র সে বিতর্ক এখানে অবান্তর। যে জন্য নবীদের আসা অর্থাৎ শান্তি আনয়ন সেটাই যখন ব্যর্থ কোরে দেওয়া হয় তখন তাঁকে শ্রদ্ধায় সম্মানে স্রষ্টার উর্ধে তুলে দিলেও কোনো লাভ নেই।

একইভাবে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণের নামে যে লীলাখেলার অপপ্রচার চালানো হোয়েছে তা বিশ্বাস কোরে তাঁর সম্পর্কে অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক উক্তি করেন, এমন কি 'লম্পট' বোলে গালাগালিও করেন (নাউযুবিল্লাহ)। আবার একদল শ্রীকৃষ্ণকে (আ:) খ্রিস্টানদের মতই খোদ 'ভগবান' বোলে বিশ্বাস করেন, শুধু অবতার মেনে তারা সন্তুষ্ট নন। আমাদের কথা হোচ্ছে তিনি স্বয়ং ভগবান হোন আর অবতারই হোন তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন অর্থাৎ দুস্কৃতিকারীর দমন কোরে সাধুজনের পরিত্রাণ এবং ধর্মরাজ্যের পুনঃসংস্থাপন। এই উদ্দেশ্য পূরণ কতটুকু হোল সেটা বিচার না কোরে, সাধারণ বঞ্চিত নিগৃহীত বুভুক্ষ

জনতাকে নির্যাতন নিপীড়নের মধ্যে ফেলে রেখে কৃষ্ণকে যতই সম্মান শ্রদ্ধার উচ্চ শিখরে বসানো হোক না কেন, সেটা প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির পরিচয় নয়, এতে সেই মহামানবও সন্তুষ্ট হবেন না।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই ভারসাম্যহীন বাড়াবাড়ি থেকে মহামানবদেরকে মুক্ত কোরে তাদের যে সত্যিকার অবস্থান ও আগমনের উদ্দেশ্য তা আমাদের সামনে তুলে ধোরেছেন। তিনি বোলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহরই একজন নবী এবং তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব সকলের জন্য অনুসরণীয়, তিনি সকল মানুষের শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। এমামুয্যামান শ্রীকৃষ্ণের (আ:) শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে হানাহানিতে লিপ্ত সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করেছেন। আজ আত্মিক পরিশুদ্ধি, পারলৌকিক মুক্তির প্রত্যাশিদের একদল মন্দিরে একদল মসজিদে একদল প্যাগোডায় একদল চার্চে একদল সিনাগগে ঢুকেছেন। নিরন্তরভাবে তাদের কেউ ওম শান্তি, কেউ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী, কেউ এলি এলি, কেউ O Father, Son, and Holy Ghost, কেউ আল্লাহু আকবার বোলে চোলেছেন। কিন্তু মানুষ অন্যায় অশান্তিতে নিমজ্জিত। মানবজীবনের সঙ্গে ধর্মের এই বিচ্ছেদ দেখে একদল হোয়ে গেছে নাস্তিক আরেকদল হোয়েছে কূপমণ্ডুক স্থবির। মানুষের জাতীয় জীবনের এই ঘোরসঙ্কটে ধর্ম কোন কাজে না আসায় সৃষ্টি হোয়েছে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আর বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র। পক্ষান্তরে আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত হোয়ে শান্তিতে বসবাস করার জন্য যে ধর্ম দরকার তা আমাদের কাছে আছে।

দাঙ্গাকারীদের স্বর্গ নেই

আমীরুল এসলাম

এসলামের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশত অনেকেই রসুলাল্লাহকে গালাগালি করে, কোর'আন পোড়ায়। যারা এই কাজগুলি করে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে তারা প্রত্যেকেই ধর্মব্যবসায়ী বা ধর্মকে ব্যবহার কোরে স্বার্থ হাসিল কোরতে চায়। যেমন প্রকাশ্যে কোর'আন পুড়িয়ে মিডিয়ায় প্রচার কোরেছেন যে টেরি জোনস তিনি একজন প্যাস্টর বা ধর্মযাজক। আমরা বোলতে চাই, যারা এভাবে অন্য ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি, আরাধ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্টুন চলচ্চিত্র ইত্যাদি নির্মাণ কোরে অপপ্রচার করে তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মেরই অনুসারী নয়, তারা শয়তানের উপাসক। তারা হোচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী দ্বারা প্রভাবিত রাজনৈতিক ধান্দাবাজদের হাতিয়ার। তারা এভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিয়ে ক্রুসেডের জন্ম দিয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধোরে চলমান দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি কোরেছে। আজকে সারা দুনিয়ায় যতগুলি যুদ্ধ চোলছে হিসাব কোরলে দেখা যাবে সেগুলির সিংহভাগই হোচ্ছে ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে। যেমন সিরিয়াতে চোলছে শিয়া-সুন্নী-জঙ্গিদের সহিংসতা, ইরাকে চোলছে বিকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ, ইসরাইল যে সারা পৃথিবীতে বিশেষ কোরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন্দল, যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়ে রেখেছে এবং পশ্চিমা দেশগুলিকে এই যুদ্ধে ব্যবহার কোরে যাচ্ছে এর পেছনেও কাজ কোরছে বিকৃত ধর্মীয় চেতনা। এই ভারতীয় উপমহাদেশেও যতগুলি হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গার সৃষ্টি হোয়েছে তার সবগুলোই এই ধর্মব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফসল। এভাবে যুদ্ধ, দাঙ্গা, সহিংসতা সব মিলিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং ধর্মব্যবসায়ীদের অন্ধত্ব দুনিয়াটিকে নরক কুণ্ডে পরিণত কোরেছে। ঈসা (আ:) সম্পর্কে আল্লাহর রসুল বোলেছেন, "মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ:) ভাই হবার ক্ষেত্রে আমি সর্বাধিক দাবিদার, তাঁর ও আমার মধ্যে আর কোনো নবী নেই" (কানজুল উম্মাল, ১৭ খণ্ড, হাদিস ১০৩৩)। অন্যত্র বোলেছেন, "দুনিয়ায় এবং আখেরাতে আমি ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ:) সবচেয়ে নিকটতম। সকল নবীরাই ভাই ভাই, কেবল তাদের মা আলাদা। তবে তাদের সবাই একই ধর্মের অনুসারী। (হাদিস- আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী)। অথচ যে বনী ইসরাইলের প্রতি ঈসা (আ:) এসেছিলেন তারা এবং খ্রিস্টানরা রসুলাল্লাহ ও এসলামের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক চলচ্চিত্র কার্টুন বানিয়ে ইচ্ছাকৃত দাঙ্গা সৃষ্টি কোরতে চায়, নিজেরা আলোচনায় আসতে চায়। আবার ঈসা (আ:) শেষ রসুল সম্পর্কে তাঁর আসহাবদেরকে বোলেছেন, "বিশ্বাস করো আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে সম্মান জানিয়েছি। এভাবে সকল নবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁর রূহকে দর্শনের মাধ্যমে নবীগণ নব্যুয়তপ্রাপ্ত হোয়েছেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম আত্মা প্রশান্ত হোয়ে গেল। আমি বোললাম, O Muhammad;, God be with you, and may he make me worthy to untie your shoelatchet; for obtaining this I shall be a great prophet and holy one of God. হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমাকে তিনি আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান কোরুন। কারণ আমি যদি এই মর্যাদা লাভ কোরি তাহোলে আমি একজন বড় নবী হবো এবং আল্লাহর একজন পবিত্র মানুষ হোয়ে যাবো। (The Gospel of Barnabas, Chapter 44)". এভাবেই একজন নবী আরেকজন নবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল

ছিলেন, অবনত মস্তক ছিলেন, একে অপরকে ভাই মনে কোরেছেন। অথচ তাঁদের বিকৃত অনুসারীরা সেই নবী বা অবতারদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত, একে অপরের রক্ত দিয়ে হোলি খেলে চোলেছে আর ভাবছে স্রষ্টা ভগবান ঈশ্বর মহাপ্রভু তাদের জন্য স্বর্গের দরজায় লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন। করুণ পরিহাস!!

যারা ধর্মের নামে দাঙ্গাবিস্তার করে তারা যে জাহান্নামে যাবে এটা আল্লাহরই ঘোষণা। তিনি পবিত্র কোর'আনে বলেন, "এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন তারা ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি কোরতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ কোরতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (সুরা বাকারা ২০৪-৬)

সুতরাং এইসব কপট, স্বার্থবাজ ধর্মব্যবসায়ী ও প্রতারক রাজনীতিকদের প্রভাব থেকে প্রকৃত ধর্মকে উদ্ধার কোরতে না পারলে মানবজাতি কোনোদিনও মুক্তি পাবে না।

রসুলাল্লাহ সম্পর্কে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণ করায় প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল বিশ্বের মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠী। ছবিতে ইন্দোনেশিয়ার এমনই একটি প্রতিবাদ মিছিলের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এটা বাস্তব সত্য যে মুসলিমরা যিশুখ্রিস্ট সম্পর্কে কখনো বাজে মন্তব্যও করে না, কারণ তাঁকে তারা নবী বোলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধের (আ:) প্রতি অসম্মানজনক উক্তি কোরতে, তাদের মূর্তি ভাঙচুর কোরতে তাদের অনেকেই দ্বিধা করে না, অথচ তারাও আল্লারই নবী।
এই ধর্মীয় দাঙ্গার ইন্ধন যোগায় ধর্মব্যবসায়ী ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা। ধর্মীয় বিদ্বেষ বন্ধ করার জন্য কয়েকটি সত্য সবাইকে জানতে হবে, তা হোল: সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একই বাবা-মায়ের সন্তান। স্রষ্টার প্রেরিত ধর্মও মূলত একটি। বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন সময়ে যারা সেই ধর্ম নিয়ে এসেছেন তারাও একই স্রষ্টারই প্রেরিত। এই বিশ্বাস যদি সকল ধর্মের মানুষ হৃদয়ে ধারণ করে তাহোলে তারা কখনোই অন্য ধর্মের অবমাননা কোরবে না। ধর্মীয় দাঙ্গার পথ চিরতরে বন্ধ হোয়ে যাবে।

মূর্তি এখন বিধাতার আসনে নেই

বিধাতার আসনে পশ্চিমা সভ্যতা

ফিরোজ মেহদী

আজকের এসলামের ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা মূর্তিপূজাকে একেবারে হারাম ও শেরকী গোনাহ ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হন। এর বেশি তারা তলিয়ে দেখেন না বা দেখতে পারেন না। যদি দেখতে পেতেন তবে বুঝতেন যে, মূর্তিপূজার চেয়েও বড় শেরকে আজ মানবজাতি ডুবে আছে। সেই শেরকের ব্যাপারে এই বিকৃত এসলামের ধর্মজীবী আলেম সাহেবরা নীরব। সেই শেরক হোচ্ছে গণতন্ত্রের পূজা, সমাজতন্ত্রের পূজা, একনায়কতন্ত্রের পূজা, প্রথাগত রাজতন্ত্রের পূজা। বর্তমানে সনাতনধর্মীরা যে প্রতিমাপূজা কোরে থাকেন তাদের মূল লক্ষ্য থাকে স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভ, পার্থিব নানা সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভ। আল্লাহর শেষ রসুল যখন মক্কায় আসেন তখনও কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে ৩৬০টি মূর্তি ছিল এবং আরব গোত্রগুলির অধিকাংশই মূর্তিগুলির পূজা কোরত। ইতিহাস এবং কোর'আন উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, সেই আরবরা মূর্তিগুলিকে আল্লাহ মনে কোরত না, তারা মনে কোরত এগুলি তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দেবে, তাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ কোরবে। অর্থাৎ তাদের মূর্তিপূজার নেপথ্যে স্রষ্টার একটি যোগসূত্র তারা বিশ্বাস কোরত। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন মতবাদ ও জীবনব্যবস্থার যে মূর্তিগুলির পূজা মানবজাতি কোরছে তার সঙ্গে স্রষ্টার কোন সম্পর্ক নেই, বরং স্রষ্টা বিমুখতা, স্রষ্টার বিধানের প্রতি বিদ্রোহ ইত্যাদিই সেগুলিতে বেশি পরিমাণে প্রকট। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, মূর্তি এখন আর এলাহ অর্থাৎ বিধানদাতা, হুকুমকর্তা, সার্বভৌমত্বের স্থানে নেই। রসুলাল্লাহ মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন যতদিন ঐ মূর্তির পুরোহিতরা সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু যখন স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল তখন আর রসুলাল্লাহর অনুসারীরা ভিন্ন ধর্মের উপাস্য, উপাসনালয় ও আরাধ্য ব্যক্তিদের মূর্তি বা ভাস্কর্য কিছুই ভাঙেন নি। এমন বহু উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

সমগ্র পৃথিবীতে আজ সার্বভৌমত্ব দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা'র হাতে। সেই এখন মানবজাতির প্রধান এলাহ বা হুকুমদাতা, ধর্ম আজ ব্যক্তি-ইচ্ছার পরিসীমায় আবদ্ধ। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবীর সামনে প্রণত হয় অথচ তারাও

সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে সঙ্গে 'একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ' গড়ার কাজ কোরছেন দেশেরপত্রের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার মো: ফিরোজ মেহেদী। স্থান: বিহারপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

তাদের জাতীয় জীবনে সেই পশ্চিমা সভ্যতার দেওয়া বিধানের সামনে কেবল প্রণতিই জানাচ্ছেন না, 'ষাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত' কোরে আছেন। রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠিরকে মন্দিরে, মহাকাব্যের পাতায় আর টিভি পর্দায় রেখে জীবন চালাচ্ছেন ব্রিটিশের বিধান দিয়ে, তন্ত্রমন্ত্রের মূর্তিই এখন তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা প্রভু। হায়রে ধর্ম!!

কাজেই এখন বুঝতে হবে কাঠ পাথরের মূর্তির পূজা হোয়ে গেছে ব্যক্তিগত আরাধনার বিষয়, প্রকৃত অর্থে ধর্ম ব্যবসায়ীদের আয়ের একটা মাধ্যম। কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য জীবনের বাস্তব অঙ্গনে এখন বড় মূর্তি হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদি। আগে ঐসব মূর্তিকে প্রত্যাখান কোরতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে সেই 'নব্য ভগবান' পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রত্যাখান করি, যারা আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি কোরেছে, যারা আজও আমাদের রক্ত শুষে দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম, হীন থেকে হীনতম কোরে ফেলছে। যারা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে গেছে, দাঙ্গা-বিভেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে গেছে, আসুন আমরা ঘৃণাভরে সেই প্রতারক সভ্যতাকে প্রত্যাখান করি এবং স্রষ্টার দিকে ফিরে যাই।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ ■

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ার লক্ষ্যে সারাদেশে হেযবুত তওহীদের যে কার্যক্রম চোলছে তার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ কোরে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার কিংসেচকান্দি গ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী ভরত চন্দ্র বর্মন।

জাতীয় ঐক্যের পথরচনা

মাহবুব আলী

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যূত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম,
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চঃ দুষ্কৃতাম,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে বোলছেন: হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজে শরীর ধারণ কোরে অবতীর্ণ হই। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হোয়ে সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন কোরি। শ্রীগীতা ৪:৭/৮

মানবজাতি যেন পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস কোরতে পারে, মানবে মানবে হানাহানি, রক্তারক্তি, অন্যায়-অবিচার, যুলুম-অত্যাচার না করে সেজন্য সর্বযুগে, সর্বজাতিতে স্রষ্টা

সকল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে "এক জাতি" হওয়ার আহ্বানে দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিচ্ছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। দিনাজপুর সদর উপজেলার শ্রী শ্রী গোষ্টাধাম শিব মন্দিরে আয়োজিত সভায় হেযবুত তওহীদের বক্তব্য শুনে এভাবেই তারা দু'হাত তুলে বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে নবী রসুল (অবতার, মহামানব) প্রেরণ কোরেছেন। হাদিস পাঠে আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দু-লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলগণের পৃথিবীতে আগমনের কথা জানতে পারি। এই সকল নবীদের মধ্যে আমরা কেবলমাত্র ভারতীয়, চৈনিক ও সেমেটিক সভ্যতার আওতাধীন ভূখণ্ডে আগত নবীদের কথাই জানতে পারি, বাকি দুনিয়ার নবী-রসুলদের ইতিহাস হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। দ্বিতীয় আদম মনু অর্থাৎ নূহ (আঃ) থেকেই মানবজাতি পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। মানবজাতির আরেক মাইলফলক এব্রাহীম (আঃ)। এই দুই মহামানবের বংশধারায় আল্লাহ বহু নবী রসুল পাঠিয়েছেন। তিনি পবিত্র কোর'আনে বোলেছেন, আমি নূহ [মনু (আঃ)] ও এব্রাহীমকে রসুলরূপে প্রেরণ কোরেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (সুরা হাদিদ: ২৫-২৬)।

অতীতের প্রত্যেক নবী-রসুলগণ যে যে অঞ্চল ও জাতিতে আগমন কোরেছেন, সেই জাতি ও সেই জাতির ভাষাতেই তারা ওহী, এলহাম, দিব্যজ্ঞান, বোধি লাভ করে সেই অঞ্চলে একই ভাষা-ভাষীর মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়েছেন। ঐসব ভাষা হিব্রু পার্শী, সংস্কৃত, পালি, চীনা বা অন্য যে কোন ভাষাই হোক না কেন। এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে মহান আল্লাহ এ সমস্ত গ্রন্থাদির মাধ্যমে বহু বিকৃত ইতিহাসের ভিড় থেকে বহু অমূল্য সত্যের সন্ধান দান কোরেছেন, যার প্রেক্ষিতে তিনি ভারতীয় বেশ কয়েকজন মহামানবকে যথা বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর, যুধিষ্ঠির, মনু, চৈনিক মহামানব তাও, কনফুসিয়াস, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ভাববাদী মহামানবদেরকে নবী হিসাবে ঘোষণা দান কোরেছেন। তাদের অনুসারীরা পৃথক পৃথক জাতিস্বত্তার রূপ নিয়েছেন। আল্লাহর শেষ রসুল এসে এই সকল জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য আহ্বান জানাতে আরম্ভ কোরলেন। তিনি বোললেন, "গ্রন্থের অধিকারী সকল সম্প্রদায়, একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণ, তা হোল- আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও এবাদত কোরব না, তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত কোরব না, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রভু বোলে মানবো না (সুরা এমরান ৬৪)"। এটাই হোচ্ছে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মূল সূত্র।

বর্তমানে স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী সভ্যতার ধারক-বাহকরা মনে করে তারা হাজার হাজার বছর থেকে মানবহৃদয়ে লালিত ধর্মবিশ্বাসকে দূর কোরে ধর্মহীনতার উপরে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরবে। এটা কস্মিণকালেও সম্ভব নয়। বর্তমানে যতই উন্নতি প্রগতির কথা বলা হোক না কেন, মানবতা, সাম্যের কথা বলা হোক না কেন, ধর্মকে এড়িয়ে সেই মানবতা, সাম্য কোনোদিনই প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। প্রচলিত বিকৃত ধর্মগুলিই এর পথে বিরাট বাধা হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিকৃত ধর্মগুলি মানবজাতিকে হাজারো দলে উপদলে বিভক্ত কোরে রেখেছে এবং সেই ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। মানবজাতির মধ্যে মানবতা প্রতিষ্ঠা কোরতে হোলে ধর্মীয় বিভেদগুলিকে চিহ্নিত কোরে সেগুলি মিটিয়ে দিতে হবে। সকল ধর্মের মূল ও সনাতন শিক্ষার মধ্যে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নেই। সেই শিক্ষার উপরেই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরতে হবে। এটাই প্রাকৃতিক, বাস্তবসম্মত। অতীতে যতবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে, এই পথেই হোয়েছে। কূপমণ্ডুক ধর্মব্যবসায়ীদের বিকৃত ধর্মের চর্চা দেখে বীতশ্রদ্ধ হোয়ে ধর্ম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মূর্খতা। প্রতিটি ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে জেনে তার উপরে দাঁড় করাতে হবে নতুন শান্তিময় সত্যযুগের ইমারত।

সমগ্র মানবজাতিকে প্রকৃত সনাতন ধর্মের শিক্ষার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে কাজ কোরে যাচ্ছেন হেযবুত তওহীদের আমীর মসীহ উর রহমান। ছবিতে ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত মধ্যপাড়া হাসামদিয়া কালীবাড়ি মন্দিরে তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে একজাতি হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। ডানে উপবিষ্ট ভাঙ্গা পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র জগদীশচন্দ্র মালো।

চলমান সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস থেকে মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ

- মসীহ উর রহমান -

মানবজাতি আজ তার জীবনকালের সবচেয়ে বড় সঙ্কটে পতিত হোয়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু কোরে সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ আজ চূড়ান্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিষ্পেষণের শিকার। পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের ওপর ধূর্তের বঞ্চনায় পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হোয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। শান্তির আশায় বিভিন্ন রকম তন্ত্র-মন্ত্র, বিধান, ব্যবস্থা তৈরি কোরে একটা একটা কোরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে। তবু কিছুতেই কিছু হোচ্ছে না। পৃথিবীর মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ। বাইরে যত সফলতার অহংকার থাকুক মনের গভীরে মানুষ আজ দেউলিয়া, দিশাহারা। কারণ মানুষ শুধুই তার শরীর নিয়ে বাঁচতে পারে না, তার আত্মাও প্রয়োজন। তেমনি এই সভ্যতার একটি মাত্র দিক, সেটা হোল ভোগ ও যান্ত্রিক উন্নতির দিক, যার কোন আত্মা নেই। এই কারণে এই সভ্যতা আর প্রাকৃতিক হোল না, স্বাভাবিক হোল না। সেহেতু এটা ধ্বংস হওয়া অনিবার্য, কেউ তাকে রক্ষা কোরতে পারবে না। ব্যক্তিগত কোন্দল, ধর্মীয় সহিংসতা, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক হানাহানি, অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, আধ্যাত্মিক শূন্যতা এই সব মিলিয়ে মানবসভ্যতা আজ চূড়ান্ত ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বিপন্ন মানবজাতিকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে পেতে বিশ্বের বড় বড় রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, চিন্তাবিদ, ধর্মবেত্তা, মনোবিজ্ঞানী সকলে চেষ্টা সাধনা কোরে চোলেছেন। কিন্তু কোন উপায় মিলছে না। রাষ্ট্রগুলি শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি কোরে, বিভিন্ন নামে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হোয়ে আপ্রাণ চেষ্টা কোরে যাচ্ছে। কিন্তু অপরাধ দিন দিন বেড়েই চোলেছে। মানবজাতির বর্তমান অবস্থার উপমা সেই রোগীর ন্যায় যার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাজার

হাজার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। একটির জন্য ওষুধ খেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে আরও দশটি নতুন রোগের উদ্ভব হয়। উপরন্তু যে ওষুধ খাওয়ানো হোচ্ছে তাও সঠিক নয়, ফলে তা রোগকে আরও জটিল থেকে জটিলতর কোরে চোলেছে। এই রোগীর মতই মানবজাতি অসংখ্য দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হোয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। মুক্তি লাভের জন্য একটার পর একটা আইন কোরে, জীবন-ব্যবস্থা পরিবর্তন কোরে যাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না হত্যা, ধর্ষণ, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও যুদ্ধের তাণ্ডব। একটি সমস্যারও সমাধান হোচ্ছে না, বরং দিন দিন নতুন নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হোচ্ছে মানুষ। **এর শেষ কোথায়?**

অবশ্যই সবকিছুরই একটা শেষ আছে। শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর বর্ণিত বহু হাদিসে এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতেও মানব সভ্যতার এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা বলা হোয়েছে। আল্লাহর রসুল বোলেছেন, এমন অশান্তি (ফেতনা-*Great Tribulation)* সৃষ্টি হবে যে মানুষ মাটির উপরে থাকার চাইতে মাটির নিচে থাকাকে বেশি পছন্দ কোরবে (মোসলেম), মানুষ মানুষকে বিনা কারণে হত্যা কোরবে, যে নিহত হবে সে জানবে না কেন যে মরল, আবার যে হত্যা কোরবে সেও জানবে না কেন সে হত্যা কোরল। হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ কোরবে (মোসলেম)। বৌদ্ধধর্মে বলা হোয়েছে, 'মারণাস্ত্র, রোগ এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রচুর হবে *[Ruling Your World by Sakyong Mipham, pg. 44]* সনাতন ধর্মে এই সময়কে বলা হোয়েছে ঘোর কলি। এই অন্যায় অশান্তি মানবজাতিকে তুমুল সহিংস এক যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার উদাহরণ আমরা দেখছি মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলি দেশে, আফ্রিকায়, পার্শ্ববর্তী মায়ানমার, ভারতে; এমন কি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকাতেও চরম অসন্তোষ ও সহিংসতা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে গত কয়েক বছরে। দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়া এই নৈরাজ্য ও হানাহানির চূড়ান্ত রূপকেই বাইবেলে বলা হোয়েছে *Armageddon, Apocalypse (Revelation 16:12-16)* ইত্যাদি। এই সব ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে অনেক বড় বড় বই লেখা হোয়েছে, আমাদের প্রশ্ন হোচ্ছে এ বিপদ থেকে উত্তরণের উপায় কি? এটা সন্দেহাতীত যে এই পরিস্থিতি মানুষেরই কাজের ফলে সৃষ্টি হোয়েছে, কাজেই এর পরিণতি ভোগ করাও অনিবার্য। এই ধ্বংস থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সচেতন মানুষেরা মাটির নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি কোরছে, বৃহদায়তন জাহাজ বানাচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রি, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র মজুদ কোরছে। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকা তো পুরো মানবজাতির পক্ষে সম্ভব না।

তাহোলে উপায়?

হ্যাঁ, উপায় আছে। সেই উপায় দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। এই মহাসত্যটি মানবজাতিকে এখনই অনুধাবন কোরতে হবে যে, যিনি মানবজাতির স্রষ্টা তিনিই ভালো জানবেন কিসে মানবজাতি এই অনিবার্য ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবে। রসুলাল্লাহর হাদিস এবং সকল ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী, এই বিপর্যয় থেকে মানুষ মুক্তি পাবে আল্লাহর হস্তক্ষেপের কারণে। **অত্যন্ত শুভ সংবাদ হোল অবশেষে আল্লাহ সেই উপায় হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন, মানবজাতির উদ্ধারকর্তা হিসাবে তিনি হেযবুত তওহীদকে মনোনীত কোরেছেন।** সেই সমাধানটি হোল আল্লাহর প্রকৃত সনাতন, সত্য ধর্ম যা তিনি যুগে যুগে তাঁর সকল নবী রসুল অবতারদের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যার সর্বশেষ সংস্করণ এসেছে ১৪০০ বছর আগে শেষ রসুলের উপর। কিন্তু আল্লাহ-রসুলের সেই শিক্ষাও গত ১৩০০ বছরের কালপরিক্রমায় বিকৃত হোতে হোতে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গিয়েছিল। আমরা দুনিয়াময় এসলাম নামে যে ধর্মটি দেখতে পাচ্ছি সেটা আল্লাহর রসুলের রেখে যাওয়া এসলাম নয়, এটা একটি বিকৃত ও বিপরীতমুখী ধর্মবিশ্বাস। বর্তমান এসলামের তথাকথিত আলেম শ্রেণি একে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার কোরছে। একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী আজ ফেরকা, মাজহাব, মাসলা মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হোয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হোয়ে আছে; আরেকটি অংশ এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোরে মানুষকে এসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। জাতির বৃহত্তম অংশটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কোরে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, কেননা এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি। অর্থাৎ যারা এসলামের অনুসারী হবে তারা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ হোচ্ছে মানবজাতিকে চলমান সঙ্কট ও আসন্ন মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বাতলে দিতে ১৪০০ বছর আগে যে এসলাম মানবজাতিকে অতুলনীয় শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ উপহার দিয়েছিল সেই এসলাম মহান আল্লাহ আবার টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের উত্তরসূরী এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান, *The Leader of the Time* জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এখন যারা আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের সামনে হেযবুত তওহীদে এসে আল্লাহকে

তার সার্বিক জীবনের একমাত্র হুকুমদাতা, একমাত্র এলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। গত ১৯ বছর ধোরে এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই মানবজাতিকে মুখে বোলে, বই লিখে, হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে, সিডি কোরে, পত্রিকার মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা কোরছে হেযবুত তওহীদ। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণি এবং এসলাম বিদ্বেষী মিডিয়ার অপপ্রচারের কারণে এই ডাক পূর্ণরূপে মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব হয় নি, যাদের কাছে পৌছানো গেছে তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি কোরতে পেরেছেন যে হেযবুত তওহীদ আসলে কি বোলতে চায়।

কিন্তু আসলেই সমস্ত মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান কি হেযবুত তওহীদ কোরতে পারবে?

এ এক বিরাট প্রশ্ন। হ্যাঁ, এনশা'আল্লাহ সমস্ত মানবজাতিকে এই আসন্ন মহা বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার কোরতে পারবে একমাত্র হেযবুত তওহীদ। এটাই আমাদের মূল কথা। **এটা ইতিহাস যে তওহীদের আহ্বান যে জাতি প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণতি কী ভয়ঙ্কর হয়। সুতরাং যতই অবজ্ঞা করা হোক, যতই অপপ্রচার করা হোক, মানবজাতিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার সমাধান আল্লাহ হেযবুত তওহীদের কাছেই দিয়েছেন, তাই এ মহাসত্যকে যারা গ্রহণ কোরবে না তাদের মুক্তির উপায় নেই।** পক্ষান্তরে আল্লাহর চিরন্তন সনাতন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরে নিলেই পৃথিবীর সকল অনিয়ম দূর হোয়ে প্রকৃতির সর্বত্র যেমন শৃঙ্খলা বিরাজিত তেমনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনে চূড়ান্ত শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোরে আল্লাহ এই জীবন-ব্যবস্থাটি প্রণয়ন কোরেছেন, তাই এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন। আগুন-পানি, আলো-বাতাস, অক্সিজেন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন পৃথিবীর সকল মানবজাতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং সবার উপযোগী, তেমনি এই জীবনব্যবস্থাও পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিদায়ক। এজন্যই আখেরী নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) এর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামীন। তাঁর উপর নাযেলকৃত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সমস্ত পৃথিবী হবে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর রসুল বোলছেন, আল্লাহ পৃথিবীকে এমন ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ কোরে দিবেন ঠিক ইতিপূর্বে পৃথিবী যেমন অন্যায় ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল (আবু দাউদ)। কোন দুইজন ব্যক্তির মধ্যেও কোন শত্রুতা থাকবে না (মোসলেম)। শান্তির উদাহরণ হিসাবে ইঞ্জিলে বলা হোয়েছে নেকড়ে ও ভেড়া একত্রে বিচরণ কোরবে *(Isaiah 11:6)*. এতে এই শান্তিময় বিশ্বব্যবস্থাকে বলা হোয়েছে *The Kingdom of Heaven.* আর সনাতন ধর্মমতে এটাই হোচ্ছে সত্যযুগের পুনরাবর্তন (বিষ্ণু পুরাণ)।

আবারও প্রশ্ন: সেই সময় কতদূর?

সেই সময় আমাদের একেবারে দোরগোড়ায় এসে গেছে। শীঘ্রই পরিবর্তন ঘোটতে যাচ্ছে এই শ্বাসরুদ্ধকর অস্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থার। অন্ধকারের পর্দা ভেদ কোরে উঁকি দিচ্ছে এক নতুন সভ্যতা। সেই বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন যা বাস্তবায়িত হোলে বিশ্বে থাকবে না কোন মারামারি, ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ! থাকবে না অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, এক কথায় অশান্তি। সাদা-কালো, তামাটে সমস্ত বনি আদম হবে একটি জাতি, এক পরিবার। একটি মানুষ ইচ্ছা কোরলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ কোরতে পারবে, কেউ তাকে বাধা দিবে না। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন খাবার আল্লাহ যা বৈধ কোরেছেন তাই সে খেতে পারবে। বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে পৃথিবীতে। আসমান তার সমস্ত রহমত ও নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিবে, জমিন তার সকল বরকত উজাড় কোরে দেবে। এই রহমত ও বরকতময় জীবন-ব্যবস্থাটাই আবার হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এটা আল্লাহ গত ২৪ মহররম ১৪২৯ হেজরী মোতাবেক ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী আল্লাহ একটি অলৌকিক ঘটনা (মো'জেজা) বা বিভূতি সংঘটন কোরে জানিয়ে দিয়েছেন। এই বিভূতির মাধ্যমে আল্লাহ হেযবুত তওহীদের এমামকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে সত্যায়ন কোরেছেন। আমরা এই মো'জেজার ঘটনা "আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা" নামক বইটিতে বিস্তারিত উল্লেখ কোরেছি। সুতরাং হেযবুত তওহীদের মাধ্যমেই মানবজাতির সকল অশান্তির মূল কারণ ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (!) অর্থাৎ দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে আল্লাহ একটি অনুপম শান্তিময় পৃথিবী মানবজাতিকে উপহার দিবেন।

মানুষের কাজের ফলে যে অন্যায় অশান্তির দাবানলে তারা আজ জ্বলে পুড়ে মরছে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার পাবার পথ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখন মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কি সত্যই এই অশান্তি থেকে বাঁচতে চায়, নাকি অনিবার্য বিপর্যয়ের শিকার হোয়ে ধ্বংস হোয়ে যেতে চায়।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ ■

মাননীয় এমামুয্‌যামান ২০০৮ সনে জঙ্গিবাদ দমনে সরকারকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তাবনা প্রেরণ করেন।

মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্‌যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মোগল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমন কি তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন গৌড়) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্‌যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। এ ব্যাপারে একটি ভুল ইতিহাস চালু আছে, বলা হোয়ে থাকে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল। হায়দার আলী চৌধুরী তার 'পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "স্বাধীন নবাব বোলে যে কথাটি প্রচলিত তা ঐতিহাসিক সত্য নয়! স্বাধীন নবাব কথাটি নাট্যকারদের লেখা। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। নবাব কোনদিন স্বাধীন হয় না (পৃষ্ঠা: ৭৭)"। তাঁর এই কথা অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ নবাব শব্দটি আরবি নায়েবের অন্যতম রূপ। আর নায়েব মানেই শাসকের প্রতিনিধি। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন মুঘল শাসকদের নিয়োজিত সুবেদার। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাংলার শাসনে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা নন। সিরাজ সিরাজ-উদ-দৌলা তার পূর্বসূরী নবাব আলীবর্দী খানসহ সবাই ছিলেন তৎকালীন দিল্লির মসনদে আসীন মুঘল সম্রাটদের অনুগত প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন শাসক এবং স্বাধীনতা গত হয় আরো অনেক আগে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সত্যিকার ইতিহাস জানতে ফিরে যেতে হবে আরো পেছনে।

মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নীর পরাজয় এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মূলত: বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে 'স্বাধীন' শাসকের অবসান ঘটে। সুতরাং ১৭৫৭ সালের ২৩ ই জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নন, ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান পন্নীর অবসানের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর শুধু পন্নী বংশই নয়, কোন শাসকই আর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন কোরতে সক্ষম হন নি। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো

ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমাণ্ডার ও জমিদারগণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য তারাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার কোরতে বাধ্য হন। মুঘল সুবেদার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পতনের পর ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চোলে যায়। আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত, বিশেষ করে মোসলেম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হোলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হোয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হোয়েছিল এমামুয্যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত করে ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন যা বর্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছিল যথা- মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে। আন্দোলনটি অনন্য শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্যামান ছাত্র

খাকসার আন্দোলনের ইউনিফর্মে এমামুয্যামান

বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের *(Special Assignment)* জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যামানের বয়স ছিলো মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী 'খাকসার' আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার পর আন্দোলনের এসলামপ্রিয় নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা চান আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হোয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং করটিয়াতে এমামুয্যামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু এমামুয্যামান আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হোতে চান না। এরপর বেশ কয়েকবছর তিনি রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। তাই যখনই সময় সুযোগ পেতেন বেরিয়ে পড়তেন শিকারে। রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে

বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন।

এভাবে এক যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র চাচাতো ভাই জনাব খুররম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোলে উক্ত আসনটি শূন্য হোয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হোয়ে যায়।

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল অ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (Constituency) পরিবর্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হোতে পারেন নি। এরপর থেকে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

বর্তমানে যারা এদেশের মানুষের ভোট নিয়ে সংসদে যাচ্ছেন বা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমরা প্রায়ই দেখি যে, তারা ভোটের সময় মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ মিনতি করে ভোটভিক্ষা করেন কিন্তু জয়লাভ করার পর নিজেদের যাবতীয় ওয়াদা বেমালুম ভুলে যান। এজন্য পরবর্তী নির্বাচনের আগে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না। তারা এলাকার উন্নয়ন কাজ অথবা আইন প্রণয়ন কোনভাবেই জনগণের সেবা করেন না, নিজেদের স্বার্থ হাসিল কোরতেই তৎপর থাকেন। এ কারণে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে গেলে জনগণও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন কি অনেক সময় অপমানিত হন। অথচ মাননীয় এমামুয্যামান যখন রাজনীতিতে ছিলেন তখন এই অঙ্গন আজকের মতন এতটা মিথ্যাচারে পূর্ণ ছিল না। তারমধ্যেও মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর অসমান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদাপূরণ, নিঃস্বার্থ জনকল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণ আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হোয়েও তিনি অনেক প্রবীণ ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকবৃন্দের সমীহ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ

মাননীয় এমামুয্যামান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে তোলা ছবি (বাঁ থেকে দ্বিতীয়জন)

আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও বিহারীদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়। দাঙ্গায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছিল এবং অবাধে চলছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। দাঙ্গায় গৃহহীন হোয়ে পড়ে শত শত মানুষ। মানুষের সরকারবিরোধী মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এসময় আইয়ুব সরকার এই দাঙ্গাকে আরও উৎসাহিত করে। কিন্তু মাননীয় এমামুয্যামান একজন এম.পি. হোয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে মানবতার কল্যাণে ঢাকার দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পাশপাশি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন।

১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

এমামুয্যামান ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। এই একই ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন জাতীয় কবি নজরুলও। মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং এর ট্রাস্টি বোর্ডের আজীবন সদস্য।

প্রকৃত এসলামের জ্ঞান লাভ

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে *(Super power)* সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত করে ফেলল, তাও আলাদা আলাদা ভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই পরশপাথর হোচ্ছে প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হোলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দী পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার এসলামের সাথে বর্তমানে এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হোচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রচলিত এসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হোয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি এসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হোয়ে গেল, তখন তিনি কয়েকটি বই লিখে এই মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হোচ্ছে তওহীদ, এটাই এই দীনের ভিত্তি। সংক্ষেপে এর মর্মার্থ হোচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। বর্তমান দুনিয়ার কোথাও এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হোচ্ছে, কিন্তু এলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে। তওহীদে না

থাকার কারণে এই মোসলেম নামক জনসংখ্যাসহ সমগ্র মানবজাতি কার্যত মোশরেক ও কাফের হোয়ে আছে। মাননীয় এমামুয্যামান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতিকে এই শেরক ও কুফর থেকে মুক্ত হোয়ে পুনরায় সেই কলেমায় ফিরে আসার ডাক দিয়েছেন। তিনি আরও বোলেছেন, আমাদের দেশসহ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি চলছে তার নেপথ্য কারণ হোল আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা বাদ দিয়ে মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করা। এই তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করে আমরা শতধাবিচ্ছিন্ন, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত দুর্বল জনসংখ্যায় পরিণত হোয়েছি। এখন আমরা যদি এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চাই তবে সকল বাদ-বিসম্বাদ ভুলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতেই হবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্যই যামানার এমামের আবির্ভাব। তিনি ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর সকল অবতারদেরকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি সালাম পেশ করেছেন। এজন্য তাঁকে বিকৃত এসলামের আলেমদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হোতে হোয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হোয়েছে, তার বাড়িতে আক্রমণ করা হোয়েছে, তার বই পোড়ানো হোয়েছে। কিন্তু তিনি সত্য থেকে এক চুলও নড়েন নি।

তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই করে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরীক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩–৬৫)।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

কে তুমি পথিক?

রিয়াদুল হাসান

কে তুমি পথিক? হিন্দু আমি।
কে তুমি? মুসলমান।
কে তুমি গেরুয়া বেশ ধোরে যাও,
বৌদ্ধের সন্তান।
আমি বোলি ভুল ভাবছো সবাই
হাজার বছর ধোরে,
এক পিতা মাতা থেকে এক জাতি
এই পৃথিবীর প'রে।

কে তুমি পথিক? গণতান্ত্রিক।
কে তুমি? সাম্যবাদী।
ভুলে যাও সব বাদ মতবাদ
ধর্মের বেসাতি।

হাতে হাত রাখো, বুকে টেনে নাও
সবাই সবার ভাই,
ভেদাভেদ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
এক জাতি হোয়ে যাই।
একই স্রষ্টার সৃষ্টি আমরা
তাঁর কাছে যেতে হবে,
তাঁর বিধানের আশ্রয় নিলে
পৃথিবী শান্ত হবে।